শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জাদুনল

জাদুনল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

“রা-স্বা”

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীজীবন চক্রবর্তী
শ্রীরানী চক্রবর্তী
ইষ্টপ্রাণেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১-৯)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল, সাদা বেড়াল
কীট
কোনওদিন এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘটনাক্রমে
ঘুণপোকা
চক্র
চুরি
চোখ
জাল
ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী
দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু
ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা
সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয় বৃত্তান্ত

সূচিপত্র

পদ্মাবতীকে একটা চুমু খেলেন সত্যচরণ।

এখন সকাল, আটটা বাজতে সাত মিনিট বাকি। আশ্বিন মাস। গত ফাল্গুনে সত্যচরণ সাতাত্তর পেরিয়ে এসেছেন, পদ্মাবতী আগামী মাঘ মাসে একাত্তরে পা দেবেন। গত আষাঢ় মাসে তাঁরা তাঁদের সম্পর্কের পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্ণ করেছেন। তবু এখনও পদ্মাবতীকে চুমু খেলে সত্যচরণের একটা পাপবোধ হয়। পদ্মাবতী অবশ্য কোনও আপত্তি করেন না, সত্যচরণ আরও এগোলেও আপত্তি করতেন না হয়তো। কিন্তু ভিতু সত্যচরণ আরও এগোতে আর সাহস পাননি।

পুবদিকের দেওয়ালে টাঙানো মস্ত এলসিডি টিভিটার ওপরেই অরুণাংশুর বাঁধানো ছবিটা টাঙানো। অল্পবয়সের ছবি। হ্যান্ডসাম, মাথাভর্তি ঘন চুল, উজ্জ্বল বুদ্ধির ঝিলিক দেওয়া চোখ। এগারো বছর আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। বলতে গেলে সত্যচরণের হাতে মাথা রেখে।

পদ্মাবতী এখনও বেশ ছিপছিপে, হাঁটুর ব্যথা আর মার্জিনাল ব্লাডশুগার ছাড়া তেমন কোনও অসুখবিসুখ নেই। পাকা চুলে কলপ করেন বলে, বয়স একটু কম দেখায়। উল বোনার ভীষণ নেশা, ওটাই বলতে গেলে পাসটাইম। এখনও হাতে উল আর কাঁটা। একটু সিরিয়াস মুখ করে নরম গলাতেই বললেন, "এই বয়সে উত্তেজনা ভাল নয় কিন্তু!"

কথাটা ঠিক। চুমুটা খেয়ে সত্যচরণের বুকটা একটু বেশি জোরে ধকধক করছিল। তাঁর হার্ট দুর্বল। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, "আজ সকালটায় কেমন যেন একটা অদ্ভুত ফিলিং হচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল হাতে যেন আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি সবকিছু সেরে নিতে হবে। কিন্তু কী সারতে হবে, কেন সেরে ফেলতে হবে সেটা স্পষ্ট নয়। খুব তাড়াতাড়ি তো আজকাল কিছুই করে উঠতে পারি না, জোর করে তাড়াহুড়ো করলে হাঁফিয়েও যাই। তবু আজ সকালের সব কিছু বেশ চটপট সেরে ফেললাম। ভাবলাম, কে জানে আজই মারা-টারা যাব কি না। বয়সটা তো হাইলি আনপ্রেডিক্টেবল। মর্নিং ওয়াক সেরেই তোমার কাছে চলে আসার সেটাও একটা কারণ।"

পদ্মাবতী ভ্রু কুঁচকে বললেন, "গত সপ্তাহেই তোমাকে চেক আপ করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম না! করিয়েছ?"

"না, হয়ে ওঠেনি। জয়তির হঠাৎ ভাইরাল ফিভার হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।"

"ওটা অজুহাত। জয়তি তো ফোনে আমাকে বলল, জ্বর নিয়েই প্যারাসিটামল খেয়ে গড়িয়াহাটায় গিয়েছিল পুজোর বাজার করতে। নিজের শরীরকে বড্ড হেলাফেলা করো তুমি। আজই ডাক্তার গুপ্তর কাছে যাও তো! অবাধ্যতা করবে না একদম।"

"ঠিক আছে, যাব। টেনশন কোরো না।"

"ওটা বলা সোজা, টেনশন কোরো না। টেনশন না হয়ে পারে? সব সময়ে হাঁ করে কী আকাশ-পাতাল ভাবো বলো তো যে, এত জরুরি একটা ব্যাপার মনে থাকছে না?"

সত্যচরণ তটস্থ হয়ে বললেন, "আমি একটু অন্যমনস্ক, তা তো জানোই। আর এটা বোধ হয় জেনেটিক। কিন্তু টেনশন করতে বারণ করছি, তার কারণ, আমার তো শরীর খারাপ হয়নি। মনটা একটু পিকিউলিয়ার বিহেভ করছে। সেটা কোনও সিরিয়াস ব্যাপার বলে আমার তো মনে হয় না।"

"তা হলে ভয় পাওয়ানোর মতো কথা বলোই-বা কেন? মারা-টারা যাব কি না, এটা কেমন কথা? শুনলে লোকের চিন্তা হবে না?"

সত্যচরণ মৃদু একটু হাসলেন।

"ওই চোরের মতো হাসি দিয়ে কিন্তু আমাকে ভোলানো যাবে না। আমিই ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিচ্ছি।"

"আরে না। ডাক্তার গুপ্ত বন্ধুমানুষ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আমাকে দেখেন।"

"কিন্তু তুমি ঠিক যাবে তো?"

"যাব। তুমি যখন বলেছ ঠিক যাব। তবে এসব কথা তো আর ডাক্তারকে বলা যাবে না যে, সকালে উঠেই আমার হঠাৎ মরার কথা মনে হয়েছে আর তাই ছুটে এসেছি!"

পদ্মাবতী এবার নিজেও হাসলেন। আগে, দশ-বারো বছর আগেও পদ্মাবতী হাসলে মাজনের বিজ্ঞাপন বলে মনে হত, এত ঝকঝকে আর পরিপাটি দাঁতের সারি ছিল তাঁর। এখন সামনের ওপরের পাটির দু'দিকের দুটো আর নীচের পাটির তিনটে দাঁত নেই। ততটা নেই আর হাসির ম্যাজিক, তবু হাসলে সত্যচরণের চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। পদ্মাবতী উলকাঁটা বেতের একটা ছোট্ট চুপড়িতে রেখে বললেন, "আমার তো মনে হয় ডাক্তারকে সব কিছুই জানানো ভাল। ওরকম যে মনে হল তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।"

সত্যচরণ পদ্মাবতীকে ওঠবার উপক্রম করতে দেখে বলেন, "হঠাৎ উঠছ যে!"

"তোমার জন্য এক কাপ ব্ল্যাক কফি করে নিয়ে আসি। শুনেছি ব্ল্যাক কফি খেলে কনসেনট্রেশন বাড়ে, মনটাও নাকি একটু ঝরঝরে লাগে।"

"ব্ল্যাক কফি নিয়ে অনেক মিথ তৈরি হয়েছে। সব বিশ্বাস করো নাকি? তুমি উঠছ কেন? জয়া তো এসেই পড়বে।"

"জয়া সাড়ে আটটার আগে আসবে না। তারপর ট্রেনের মেজাজ-মর্জিও আছে। আর ব্ল্যাক কফি সবাই তো বানাতে পারে না!"

"আমার তো তাড়া ছিল না।"

"আজ আমারও একটু খেতে ইচ্ছে করছে। বোসো না, ইলেকট্রিক কেটলিতে বানিয়ে নেব, সময় বেশি লাগবে না।"

পদ্মাবতী দাঁড়ালেন। পরনে একটা হাউসকোট, হালকা নীলের ওপর সূর্যমুখীর ছাপ। পদ্মাবতী বেশ লম্বা, তবে ঢ্যাঙা নন। যৌবনের চটকটা আর নেই, কোনওক্রমে যাই-যাই একটু রূপ এখনও চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাওয়ার আগে একটু থমকে আছে। কিংবা সেটা সত্যচরণের দেখার ভুলও হতে পারে। পদ্মাবতীকে তিনি কখনও কি নির্মোহ চোখে দেখেছেন? সে দেখা যেন তাঁকে দেখতেও না হয়।

পদ্মাবতীর ফ্ল্যাটটা বড়ই। তিন তলায় তিনটে শোওয়ার ঘর আর এই বিশাল লিভিং রুম। পদ্মাবতীর দিন রাত এই ঘরটাতেই কাটে। ছেলে মন্টু অস্ট্রেলিয়ায়, মেয়ে তটিনী চণ্ডীগড়। পদ্মাবতী একা এবং এই একাকিত্ব

তাঁর বিশেষ প্রিয়ও বটে। বলেনও, "আমি একাই সবচেয়ে ভাল থাকি। আমি কাউকে মিস করি না। ছেলেমেয়ে শুনলে দুঃখ পাবে হয়তো, কিন্তু আমি একা হলেই জীবনটাকে বেশি বুঝতে পারি।"

দুটো মাগে করে ব্ল্যাক কফি নিয়ে এলেন পদ্মাবতী। সত্যচরণ যে কালো কফি খুব পছন্দ করেন তা নয়। তবে খেয়েও নেন। উপভোগ করেন না অবশ্য। পদ্মাবতীও কালো কফির ভক্ত নন। তবে বোধ হয় কালো কফির উপকারিতার জন্যই আজ এই আগ্রহটা। দু'জনে ডাইনিং টেবিলের পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে কফি খেতে লাগলেন। পদ্মাবতী সত্যচরণের দিকে চেয়ে একটু স্মিতমুখে বললেন, "বাব্বা, চুমুকের যা শব্দ!"

সত্যচরণ বলেন, "আসলে ভাল লাগানোর চেষ্টা করছি। শব্দটা তারই বিজ্ঞাপন।"

পদ্মাবতী সস্নেহে বলেন, "হ্যাঁ গো, বেশি কড়া হয়ে গেছে নাকি? খুব কষ্ট হলে খেয়ো না।"

"আরে না, ঠিকই আছে। আমার খারাপ লাগছে না। মনে-মনে দুধ-চিনি মিশিয়ে নিচ্ছি।"

"যত বয়স বাড়ছে তত দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ কিন্তু।"

আলটপকা সত্যচরণের একটা কথা মনে এল। পদ্মাবতীর ভূতের ভয় নেই। পদ্মাবতী একা এই ফ্ল্যাটে দিব্যি থাকেন। সত্যচরণের আবার ভীষণ ভূতের ভয়। এতটাই যে, কখনও একা ঘরে শুতে পারেন না। নতুন বিয়ের পর ভাড়াবাড়িতে সবে সংসার পেতেছেন। জয়তির একবার দরকার পড়েছিল বাপের বাড়ি যাওয়ার। বোধ হয় এক বন্ধুর বিয়েতে। সত্যচরণ নানাভাবে ফাঁড়া কেটে যাওয়াটা আটকাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লাভ হয়নি। জয়তি চলে যাওয়ার পর সন্ধের পর বাড়ি ফিরে ঠিক করলেন সাহস করে একাই থেকে দেখবেন। কিন্তু রাত বাড়তেই এমন ভয় চেপে ধরল যে শেষপর্যন্ত রাস্তা থেকে এক বুড়ো ভিখিরিকে পঞ্চাশ টাকা কবুল করে নিয়ে এসে ঘরে শুইয়েছিলেন। সেই ঘটনা চাউর হতে সময় নেয়নি। আজও তাঁর কাপুরুষতার সেই কাহিনি প্রচারিত আছে। তাঁর ছেলেমেয়েরাও জানে।

সত্যচরণের পকেটে মোবাইলটা বাজছে। বাজবারই কথা। তিনি কোথাও বেরোলে জয়তি ঘনঘন ফোন করতে থাকে। ঠিক আছ তো! কত দূরে আছ? ফিরতে কত দেরি হবে? ফোনটা বের করে দেখলেন, জয়তিই।

"বলো।"

"কোথায়?"

"এই তো পদ্মাবতীর ফ্ল্যাটে। কফি খাচ্ছি।"

"আজ এত ভোর-ভোর বেরিয়ে গেছ কেন? যাওয়ার সময়ে বলেও যাওনি!"

"হ্যাঁ, আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে।"

"তুমি তো জানো, সকালে উঠে প্রথম তোমার মুখ না দেখলে আমার দিন ভাল যায় না!"

সত্যচরণ একটু দ্রব হয়ে পড়লেন। যদিও কুসংস্কার তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও করে। কারও কাছে তাঁর এতটা দাম আছে, এ কি কম কথা? একটু নরম গলায় বললেন, "হ্যাঁ, জানি তো! কিন্তু তোমার ঘুমের সমস্যা আছে বলেই ডাকিনি। দেখলাম নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছ, তাই ডাকতে মায়া হল।"

"রোদ বেশি চড়ার আগেই চলে এসো কিন্তু।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই একটু কথা বলছি, একটু বাদেই ফিরব।"

পদ্মাবতী ফের উলকাঁটা হাতে নিয়েছেন। বুনতে বুনতেই বললেন, "তোমার বউ কিন্তু তোমার জন্য খুব ভাবে। এত ভালবাসা, তবু তোমার গাল ওঠে না কেন?"

কফিটা শেষ করলেন সত্যচরণ, মুখটা তেতো স্বাদে ভরে আছে। জিবের তিক্ততা নিয়েই বললেন, "ওটা ভালবাসা নয়, বাতিক।"

"ভালবাসা তবে কেমন হয় বলো তো, আমি তো জানি না। আমার ছেলে-মেয়ের ধারণা, আমি নাকি ওদের ভালবাসি না, তার কারণ, আমি ওদের কাছে যেতে চাই না। বুঝি না বাবা, ক্যানবেরা বা চণ্ডীগড়ে গিয়েই কেন ভালবাসা দেখাতে হবে! দৌড়ঝাঁপ আমার কোনওদিন ভাল লাগে না বলে আমি তো অরুণের সঙ্গেও কখনও বেড়াতে যাইনি। ফোন হচ্ছে, ভিডিয়ো কল হচ্ছে, তবু টানাটানি করা চাই।"

"কেনই-বা যাও না? সারাক্ষণ ঘরে একা কী আনন্দ পাও তুমি কে জানে!"

"ভালবাসা মানে তো সবসময়ে প্রক্সিমিটি নয়। যে জওয়ান ফ্রন্টে পড়ে আছে, সে কি তার বউকে ভালবাসে না! বেশি প্রক্সিমিটিই বরং ভালবাসাকে ফিকে করে দেয়। এই তোমার যেমন হয়েছে। বউ সবসময়ে কাছে থাকে, খোঁজখবর নেয়, কিছু হলে হামলে পড়ে, আর তাইতেই সে জলভাত হয়ে গেছে।"

সত্যচরণ বিপন্ন মুখে বলেন, "আরে, অতটা কঠোর হোয়ো না পদ্মাবতী, ভালবাসা নেই তা বলছি না। তবে সেটা বুড়ো বয়সে ডেভেলপ করেছে। আর তাতে অনেক বাইবাতিকও এসে জুটেছে।"

"ভালবাসার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। ওই বাইবাতিকও। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ইনসিকিওরিটি থেকে ওসব আসা স্বাভাবিক। দুনিয়ায় এমন ডাকাবুকো কেউ নেই যে, ভালবাসার পাত্রটির জন্য দুশ্চিন্তায় ভোগে না।"

সত্যচরণ একটু অবাক হয়ে বলেন, "তোমারও বাইবাতিক আছে নাকি? এমনভাবে বলছ, যে মনে হচ্ছে, তোমারও আছে!"

ফিক করে হেসে ফেললেন পদ্মাবতী। মুখে হাসিটা ধরে রেখেই বললেন, "আছে বাপু। তবে সেসব শুনতে চেয়ো না যেন। ছেলেপুলের মা হয়েছি না! তার খাজনা না দিয়ে উপায় কী বলো! অরুণাংশুর জন্য ছিল। আর সত্যিকথা বলতে হলে বলি, তোমার জন্যও আছে।"

ঠিক শিহরন হল না হয়তো, কিন্তু সকালটা আজ হঠাৎ আর-একটু উজ্জ্বল হল যেন সত্যচরণের চোখে। এইসব ছোটখাটো হঠাৎ-পাওয়া পুরস্কারের জন্যই তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। যে শ্বাসটা মোচন করলেন সত্যচরণ সেটা দীর্ঘশ্বাসই বটে, তবে তাতে কোনও হাহাকার নেই, বরং স্বস্তি আছে।

অরুণাংশুর ছবির খানিকটা ওপরে একটা দেওয়ালঘড়ি। সেদিকে তাকিয়ে সত্যচরণ বললেন, "তোমার জয়া তো এখনও এল না!"

"আসবে। গাড়ির গোলমালে দেরি হয় মাঝে-মাঝে। না এলেও ক্ষতি নেই। একা মানুষ, চলে যাবে। শুধু ঘরদোর ঝাঁটপাট দিতে পারি না আর বাসনও মাজতে পারি না হাঁটুর জন্য। তা হলেই-বা কী, বাসনের তো অভাব নেই। রান্নাবান্নারও ঝামেলা করতে হবে না, ফ্রিজে যা আছে গরম করে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

"জয়া তো শুনেছি তোমার কাছে চব্বিশ ঘণ্টার লোক হিসেবে থাকতে চেয়েছে। রাজি হচ্ছ না কেন?"

"পাগল হয়েছ? বর্ষার সময় একবার ট্রেন বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে থাকতে দিয়েছিলাম। রাতে অস্বস্তিতে আমার ঘুমই হল না।"

"অস্বস্তিটা কেন বলো তো! চুরির ভয়?"

"তাও নয়। মেয়েটা চোর নয় বোধ হয়। তবু অস্বস্তি, একা থাকার ভুতুড়ে অভ্যেস তো!"

"আর ছেলেমেয়েরা এলে?"

"লজ্জার কথা আর কী বলব বলো, সত্যি কথা বলতে গেলে ওরা এলেও অস্বস্তি হয়, তবে কম। আর নাতি-নাতনিরা সব অস্বস্তি কাটিয়ে দেয়। ওদের কখনও আগন্তুক বলে মনেই হয় না।"

"আমার ঠিক উলটো। সঙ্গে জয়তি না থাকলে একা বিছানায় শুতেই পারব না।"

"সে তো জানি। তোমার তো ভূতের ভয়। আমার ভূতের ভয় নেই কেন জানো? আমি নিজেই ভূত হয়ে গেছি বলে। হ্যাঁ গো, বউকে এখনো চুমুটুমু খাও তো?"

সত্যচরণ লাজুক হেসে বলেন, "ওই প্রক্সিমিটি থেকে একটুআধটু ঘনিষ্ঠতা তো হতেই পারে। তবে জয়তিও তোমার মতোই বলে, এই বয়সে উত্তেজনা ভাল নয়।"

ডোরবেলের শব্দ হল। পদ্মাবতী বললেন, "ওই বোধ হয় জয়া এল।"

সত্যচরণ উঠলেন, "বললেন, তোমাকে উঠতে হবে না, আমি জয়াকে দরজা খুলে দিয়ে চলে যাচ্ছি। নইলে জয়তি আবার ফোন করবে।"

পদ্মাবতী ভারী সুন্দর করে হেসে বললেন, "এসো গিয়ে। আর ওসব মরা-টরার কথা মাথা থেকে তাড়াও। বেঁচে না থাকলে কি আমাদের চলে, বলো! একটুখানি তো জীবন, টুকুস-টুকুস করে আরও অনেক বেঁচে থাকো তো! আর আজ কিন্তু সন্ধেবেলা ডাক্তার গুপ্তর কাছে যাবে। মনে থাকবে তো! আমি ফোন করে মনে করিয়ে দেব।"

সত্যচরণ গম্ভীর হয়ে বলেন, "মনে থাকবে, তবে তুমি ফোন করলে মন ভাল হয়ে যাবে।"

জয়া এক দিঘল চেহারার মেয়ে। লকলকে শরীর আর ভারী মিষ্টি মুখখানা। একটু গোলমতো, বড়-বড় চোখ, নাকটা তেমন তীক্ষ্ণ নয় বটে, কিন্তু মুখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। পরনে দামি সালোয়ার কামিজ, হালকা নীল রঙের ওপর বহুবর্ণ সুতোর জ্যামিতিক নকশা। হাতে দামি স্মার্ট ফোন। সত্যচরণ শুনেছেন জয়া ফেসবুক করে, হোয়াটসঅ্যাপ করে, মেসেজ করে, ই-মেল করতে পারে এবং পদ্মাবতীর ল্যাপটপে সে ভিডিয়ো কলও সেট করে দেয়। আর তার একজন মোটরসাইকেলবাজ বয়ফ্রেন্ডও আছে। সেই প্রেমিকই তাকে রোজ স্টেশন থেকে নিয়ে এসে পদ্মাবতীর বাড়িতে পৌঁছে দেয়, আবার রাতের দিকে স্টেশনেও দিয়ে আসে। প্রেমিকটি চাকরি খুঁজছে এবং ভাড়ার বাসাও। দুটোই পেয়ে গেলে তাদের বিয়ে।

তাঁকে দেখে ভারী খুশির হাসি হাসল জয়া, "মেসোমশাই, কখন এলেন?"

"এই তো একটু আগে।"

"আরে, চলে যাচ্ছেন কেন? চা খাবেন না? এক্ষুনি চা করব তো!"

"না রে, কফি খেয়েছি, আর নয়।"

"কফি কি মাসিমা করল? এ মা, আমার আজ দেরি হয়ে গেছে! একটু বসুন না, আজ আমি ভেজ-মোমো বানাব বলে সব গুছিয়ে রেখে গেছি। মাসিমার তো আজ একাদশী।"

"আজ নয় রে, আর-একদিন হবে। তোর মাসিমা কি একাদশী করে নাকি?"

"ও বাবা, করে না আবার! এবার আপনি অনেকদিন পরে এলেন কিন্তু!"

"হ্যাঁ রে, সবসময়ে সময় করে উঠতে পারি না তো!"

"আপনি এলে মাসিমা খুব খুশি হয়।"

সত্যচরণ একটু হাসলেন। লিফট নিলেন না, একটু একসারসাইজ হবে বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তৃতীয় ধাপটায়। তাই তো! আজ একাদশী! আজ পদ্মাবতীকে চুমু খাওয়াটা কি কোনও না কোনওভাবে একটা অপরাধ হল? একাদশীতে চুমু খাওয়া বারণ কি না এটা তো কাউকে জিজ্ঞেসও করা যাবে না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে পদ্মাবতীদের হাউজিং কমপ্লেক্স। বেশ নিরাপদ। পাহারা-টাহারা আছে, যেমন থাকে। আর ভিতরেই আছে চক্রাকারে হাঁটার পথ। খুব ভোরে আর বিকেলে পদ্মাবতী কয়েকজন সমবয়সির সঙ্গে এখানেই হাঁটাহাঁটি করেন। গল্পগাছা হয়। নিজেকে গুটিয়ে ছোট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন পদ্মাবতী। কেন, সে রহস্য ভেদ করা যায়নি।

লেক গার্ডেনস থেকে ঢাকুরিয়া, বেশ অনেকটাই দূর। তাই একবার ভাবলেন রিকশা নেবেন কি না। মনে হল রোদের ততটা তেজ নেই। একটু হালকা মেঘ আছে। হাঁটতে খারাপ লাগবে না। পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল জয়া, "মেসোমশাই, আপনার টুপি! মাসিমা বললেন, ছুটে গিয়ে দিয়ে আয়, নইলে রোদ লাগাবে।"

তাই তো! বড্ড ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে যে! অ্যালঝাইমারসের লক্ষণ নয় তো! একটা থ্যাঙ্ক ইউ বলে সাদা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে নিলেন।

তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই হাঁটছে একাদশী শব্দটা আর হালকা একটু মনখারাপ। পাপ হয়ে গেল না তো! যারা সাহসী তারা এসব গায়েই মাখে না, আর তারাই জীবনটাকে ডেঁড়েমুশে ভোগ করে। মুশকিল এই তাঁদের মতো আধা মরালিস্টদের। আজ একাদশী এটা না জানলে তাঁরও অবশ্য কিছু হত না। আর পদ্মাবতী একাদশী না করলেও কিছু হত না। মনে হয় তাঁর মাথার মধ্যে একটা মাকড়সা আছে। সে ব্যাটার কোনও কাজ নেই, যখন-তখন যে-কোনও সামান্য ঘটনা নিয়ে মাথার মধ্যে অযথা জটিল জাল বুনতে শুরু করে। আর তার ফলে সত্যচরণ প্রায়ই রাস্তাঘাটে আনমনা হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। বলতে কী, এইমাত্র একটা রিকশা প্রায় তাঁকে একটু ছুঁয়ে চলে গেল।

জয়তি মানেই বড়-বড় চোখ, জয়তি মানেই গোলগাল পুতুল-পুতুল, নরম-সরম, আহ্লাদী মেয়েমানুষ, জয়তি মানেই ভীষণ সধবা, শাঁখা-পলা-নোয়ায় সাজানো লক্ষ্মীবউ, জয়তি মানেই সিঁথি থেকে কপাল থেকে নাকের ডগা অবধি ঝরা সিঁদুর, জয়তি মানেই গয়নার ঝনৎকার, জয়তি মানেই পানে ঠাসা গাল আর রাঙা ঠোঁট, জয়তি মানে আরও অনেক কিছু। ছেলে জিষ্ণু আর মেয়ে সম্বিতা বলে, মা মানেই উনিশ শতক। না, ছেষট্টিতে এসে জয়তি আর ঠিক সেরকমটি নেই। শরীর শুকিয়ে গেছে অনেক, গালের হনু দেখা যায়, মাথার চুলের সেই গোছ আর নেই, চোখে চশমা উঠেছে, তড়বড়ানিও আগের মতো নেই, গতি অনেক মন্থর। গয়না পরা ছেড়েই দিয়েছে, শুধু শাঁখা-নোয়া আর দু'গাছা করে সোনার চুড়ি। নাকে নাকছাবিটা অবশ্য আছে। বউয়ের সোনা ছোঁয়া শ্বাস নাকি তার স্বামীর পক্ষে মঙ্গলকারক। তা হবে। সত্যচরণ এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। ভাবেন, আমি জানিই-বা কতটুকু।

জিষ্ণু আর সম্বিতা দু'জনেই আমেরিকায়। জিষ্ণু শিকাগো, সম্বিতা ফ্লোরিডায়। তিনি আর জয়তি দু'বার চার মাস করে থেকে এসেছেন। সত্যচরণের আমেরিকা খারাপ লাগে না কিন্তু বেশিদিন থাকলে মন পালাই পালাই করে। ফিরে আসার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু যার আমেরিকা বেশি অপছন্দ হওয়ার কথা, সেই

জয়তি সে দেশটাকে প্রায় ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিল। এমনকী, একথাও প্রায়ই বলত, এখানেই বেশ থেকে যাই না গো! কত সুবিধে বলো তো! পান, খয়ের, পোস্ত, ইলিশ সবই তো পাওয়া যায়!

আর-একটা ছেলে আছে সত্যচরণের। বায়োলজিক্যাল নয় অবশ্য, তবু সে ছেলেই। রজত। রজত সিং। সতেরো-আঠারো বছর আগেও তাঁর একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাবসা ছিল। মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টস। তাঁর পার্টনার ছিল ধরম সিং। বিহারের, পরে ঝাড়খণ্ডের লোক। সতেরো বছর আগে যখন হঠাৎ স্ট্রোকে বিপত্নীক ধরম মারা যায়, তখন রজতের বয়স ছ'বছর। দেশ-গাঁয়ে খোঁজ করেও ধরমের বাড়ির কারও হদিশ পাওয়া গেল না। কোনও আত্মীয়স্বজনও এল না ধরমের পাওনাগন্ডা বুঝে নিতে। আক্ষরিক অর্থেই তখন রজত এক অনাথ বালক। তাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠানোরই তোড়জোড় চলছিল। গড়িয়ায় ধরমের ছোট ভাড়াটে বাসায় এক বেবিসিটারের কাছে ছিল রজত। বাবাকে খুব খুঁজত। কাঁদত। কেউ গেলেই জড়িয়ে ধরে বলত, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে? একদিন তিনি গেলে তাঁকেও জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো না! বাবা কেন আসছে না এখনও? সত্যচরণ নিজেও হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। আর সেদিনই মনস্থির করে বাচ্চাটাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। যা হওয়ার হবে, একে তিনি ছেলের মতোই মানুষ করবেন। কাজটা সহজ ছিল না। পুলিশের ঝামেলা ছিল, জয়তি খুশি হয়নি, তবে জিষ্ণু আর সম্বিতা একটা গোপাল গোপাল বাচ্চাকে পেয়ে খুব খুশি। জয়তি আঁশটে মুখ করে বলতে লাগল, "এত গ্যাদড়া বাচ্চা, খাইয়ে দিতে হবে, চান করিয়ে দিতে হবে, দাঁত মাজাতে হবে, হাগলে ছুঁচিয়ে দিতে হবে, কে করবে এত সব? রাতে শোবেই-বা কার কাছে?"

সমস্যা ছিলই। কিন্তু সত্যচরণ ধরমের ছেলেকে ফেলেও দিতে পারেন না। পুরনো বেবিসিটারকে ধরে আনা হল। কিন্তু মেয়েটি রাতে থাকতে রাজি নয়। রাতে তা হলে রজত থাকবে কার কাছে? জয়তি তাকে কিছুতেই নিজেদের বিছানায় অ্যালাউ করবেন না। সম্বিতা বলল, "আমার কাছে থাকুক, তবে রাতে পটি-টটি করলে আমি কিছু করতে পারব না।"

তখন সত্যচরণ বললেন, "কাউকে দরকার নেই। আমি আলাদা বিছানায় ওকে নিয়ে শোব। সবে বাবাকে হারিয়েছে, ওর এখন বাবার দরকার।"

টানা তিন বছর একই ঘরে জয়তি এক বিছানায় আর রজতকে নিয়ে আলাদা বিছানায় সত্যচরণ শুয়েছেন। পটি পরিষ্কার করেছেন, ছুঁচিয়ে দিয়েছেন, দাঁত মাজিয়েছেন, যেমনটা তিনি নিজের ছেলেমেয়ের জন্যও করেননি। বাচ্চাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল। নিজের বাবাকে ভুলে সত্যচরণকে আঁকড়ে ধরতে রজতের বেশি সময় লাগেনি। তাই প্রথম তিন মাসের পর বেবিসিটারকেও বিদায় দিয়েছিলেন সত্যচরণ। বলতে গেলে রজত তাঁর হাতেই মানুষ। একটা বাংলা স্কুলে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। মেধাবী ছাত্র ছিল না সে। তবে পাশ করে যেত। খুব দুষ্টুও ছিল না। একটু ভালমানুষ গোছের। হাসিমুখে সবার ফাইফরমায়েশ খাটত, যেটা সত্যচরণ একদম পছন্দ করতেন না। কিন্তু রজতের হয়ে কিছু বলতে গেলেই ঝামড়ে উঠত জয়তি, "কোন কুটুমটা শুনি যে বসে বসে খাওয়াতে হবে! কাজ করতে কি গতর ক্ষয় হয়ে যাবে নাকি! আমরা কি কাজ করি না?"

রজতের বয়স যখন বছর দশেক, তখন একদিন রাতে ফিরে সত্যচরণ দেখলেন, রজত রান্নাঘরের পাশে বাসন মাজার জায়গায় বসে খুব মন দিয়ে বাসন মাজছে। সত্যচরণ অবাক হয়ে বললেন, "এ কী? ও বাসন

মাজছে কেন?"

জয়তি ঠান্ডা গলায় বললেন, "আজ ঝুমা আসেনি, তাই ক'খানা বাসন একটু ধুয়ে দিচ্ছে।"

সত্যচরণ বুঝলেন, রজত এক অবধারিত পরিণামের দিকে চলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই ও হয়ে যাবে বাড়ির চাকর। সত্যচরণ কোনও প্রতিবাদ করলেন না। শুধু সোজা গিয়ে রজতের পাশেই বসে পড়লেন। বললেন, "আয়, আজ বাপ-ব্যাটায় মিলে বাসনগুলো মেজে ফেলি।"

রজতের কোনও আপত্তিই শুনলেন না। বললেন, "তুই যদি মাজতে পারিস, তা হলে আমিও পারি।"

জয়তি খুব চেঁচামেচি জুড়েছিলেন সেদিন। জিষ্ণু আর সম্বিতাও এসে বাবাকে টানাটানি করে তোলার চেষ্টা করেছিল, নিজেরাও মাজতে চেয়েছিল, কিন্তু সত্যচরণ নড়েননি। তখনই তাঁর ষাটের ওপর বয়স। পরে জয়তি ছলছলে চোখে এসে বলল, "তুমি আমার এঁটো বাসন ধুয়েছ, আমার তো পাপ হয়ে গেল! এখন কী হবে!"

সত্যচরণ বললেন, "যদি পাপ বলে বুঝে থাকো, তা হলে প্রায়শ্চিত্ত করো। রজতের প্রতি তোমার মনোভাব পালটাও।"

জয়তির তবু খুব একটা পরিবর্তন হল না। আর চাকরের কাজ করাত না বটে, কিন্তু নানাভাবে রজতকে বুঝিয়ে দিত যে, সে এ বাড়ির কেউ নয়। একদিন শুনলেন কাজের মেয়ে ঝুমা রজতের এঁটো বাসন মাজতে চাইছে না। বলেছে, "ওর বাসন আমি মাজব কেন? ওর বাসন তো ওরই মাজবার কথা। এ বাড়িতে আমিও যা ও-ও তা।" সত্যচরণ ঝুমাকে ডেকে পরদিন বললেন, "রজতের বাসন মাজবার জন্য তোকে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশি দেব। কথাটা যেন রজত বা জয়তির কানে না যায়!"

ঝুমা আর আপত্তি করেনি।

প্রথমে জিষ্ণু হায়ার স্টাডিজের জন্য, তার তিন বছরের মাথায় এক অতি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে সম্বিতাও আমেরিকা চলে গেলে বাড়িটা যেন মূক আর বধির হয়ে গেল হঠাৎ। সারা বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। আর যেন কেমন একটু অচেনাও লাগছে বাড়িটাকে। দিনের বেলাটা হত না, কিন্তু রাতের খাবারটা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একসঙ্গেই খেতেন সত্যচরণ। এখন শুধু রজত আর তিনি। খাওয়াটা আজকাল খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

ওই খাওয়ার টেবিলেই একদিন হঠাৎ জয়তির মুখ খুব থমথমে। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন জয়তি হঠাৎ রজতের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে, "পবনকুমার সিং তোর কে হয় রে রাজু?"

রাজু অর্থাৎ রজত একটু থতমত খেয়ে অবাক হয়ে বলে, "কে পবনকুমার সিং?"

"সেটা তো তুই বলবি। আজ দুপুরবেলা এসেছিল। লম্বা-চওড়া চেহারা। বলল, সে ধরমের চাচাতো ভাই, তোর চাচা। তুই নাকি তাকে একটা চিঠি লিখেছিস দেশে যাবি বলে! সত্যি নাকি?"

রজতের তখন চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স। হঠাৎ করে বয়সের টানে বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। গোঁফের অস্পষ্ট রেখাও দেখা দিয়েছে সবে। মাথাটা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে খুব ভয় খাওয়া গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তোর তিন কুলে কেউ আছে বলে তো জানতাম না। হঠাৎ এই চাচাই-বা এল কোথা থেকে?"

রজত ঘাবড়ে গিয়ে জল খেতে গেল। বিষমও খেল। তারপর মাথা নিচু করে খুব ভয়ে-ভয়ে বলে, "এই চাচাজির কথা বাবার মুখে শুনেছিলাম।"

সত্যচরণের মাথাটা গরম হয়ে উঠছিল, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলালেন। এ বাড়িতে রজতের বন্ধন তো একমাত্র তিনি। জয়তি কোনওদিন রজতকে পছন্দ করেনি। সুতরাং ওর যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে হয়, তা হলে সেটা অন্যায় বলা যায় না।

জয়তি ঝামড়ে উঠে বলল, "কোথাকার লতায়-পাতায় সম্পর্ক, জানা নেই শোনা নেই, হঠাৎ তাকে চিঠি দিয়ে একেবারে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে ফেললি? দেশে তোর কোন জমিদারি আছে রে নিমকহারাম, বেইমান! এতকাল দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষলুম!"

এমনিতে রজতের কোনও ভাবাবেগ দেখা যায় না। কথা খুব কম। কিন্তু এই প্রথম জয়তির কথায় ও প্রথমে হতভম্ব হল, তারপর চোখদুটো হঠাৎ জলে টসটস করতে লাগল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ নিজেকে সামাল দিল সে। তারপর ধরা গলায় বলল, "কী করব বলো তো মা! আমি তো বুঝতে পারি এ বাড়ি আমার নয়। স্কুলের বন্ধুরা বলে, তুই তো বিহারি, তোকে তো ওরা একদিন তাড়িয়েই দেবে। ঝুমা আমাকে বলে, ও আমার এঁটো বাসন মাজতে ঘেন্না পায়, বাবা বেশি টাকা দেয় বলে মাজে। আমার জন্য তোমারও তো কত অসুবিধে হয় আমি জানি। আমি কী করব বুঝতে না পেরে অনেক দিন আগে আন্দাজে গাঁয়ের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। দেশ ছাড়া আমার তো আর যাওয়ার জায়গা নেই!"

রাগের চোটে হঠাৎ গলা চৌদুনে উঠে গেল জয়তির, "কেন লিখেছিলি রে বদমাশ? আমাকে জব্দ করতে?"

রজত একটু মিনমিন করে বলে, "না মা, তোমাকে জব্দ করব কেন? আমাকে তো একদিন চলেই যেতে হবে!"

জয়তির গলা আরও চড়ে গেল, রাগে ফেটে পড়ে বলল, "কেন চলে যেতে হবে রে, শয়তান! আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, তোকে এ বাড়ি ছেড়ে কেন যেতে হবে! আর বোঝাতে যদি না পারিস তো, আমি তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগাপাশতলা বেত দিয়ে পেটাব। আর ইস্কুলে কে তোকে বিহারি বলেছে? তার মুখ ভেঙে দিয়ে আসতে পারিসনি! আর ঝুমা আসুক, ওরই একদিন কি আমারই একদিন!"

সত্যচরণ আর রজত দু'জনেই জয়তির চেঁচামেচিতে হতভম্ব। আচরণটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না কারওই।

জয়তি এবার হঠাৎ সত্যচরণের দিকে চেয়ে ধমকের গলায় বলল, "তোমার গলায় কি ময়দার গোলা আটকে আছে? বাক্যি হরে গেছে কেন? উঠে এসে এই বেয়াদব ছেলেকে থাপ্পড় মারতে পারছ না? ওর এত বড় সাহস যে, গৃহত্যাগ করতে চায়! দেশে যাবে! বুঝলে! দেশে যাবে।! ওর কোন আপনজন সেখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে ওর জন্য বসে আছে বলবে আমাকে? ওর কত বড় সাহস, আমার মুখের ওপর বলে দিতে পারল যে, এ বাড়ি ওর নয়!"

সত্যচরণ মৃদু হেসে বললেন, "সেটা তো মিথ্যে নয়।"

"এ বাড়ি ছাড়া ওর আর কোন বাড়ি আছে শুনি! এই তুমিই লাই দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ, কখনও শাসন করোনি, তাই ওর আজ এত সাহস!"

কথাটা মাথায় ঢুকলই না সত্যচরণের। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "আমি আবার কী করলাম!"

"তোমার প্রশ্রয়েই আজ ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে পারল!"

এর পর তাঁকে আর রজতকে হতচকিত করে দিয়ে হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল জয়তি। মাঝে-মধ্যে নানা ছোটখাটো কারণে কাঁদে বটে, কিন্তু তার এরকম আলুথালু কান্না সত্যচরণ কখনও দেখেননি। ডাইনিং টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে যেন কান্নার বান।

রজত সোজা-সরল ছেলে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সত্যচরণের দিকে অসহায় চোখে চেয়ে বলে, "মা আমার ওপর খুব রেগে গেছে বাবা!"

সত্যচরণ মৃদু হেসে বললেন, "এখন মায়ের কাছটিতে চুপ করে বসে থাক। নড়িস না।"

রজত বাধ্যের ছেলে। বসে রইল। কান্না একসময়ে থামল। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময়ে জয়তি হঠাৎ রাগের গলায় বলল, "আমার কাছে বসে আছিস কেন? শুতে যা না!"

"তুমি খাবে না?"

"আমার খাওয়া নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। তুই আমার কে?"

এসব কথার জবাব দেওয়ার মতো বুদ্ধি রজতের নেই। সে তেমন চোখা চালাক ছেলেও নয়। খুব বিষণ্ণ গলায় বলল, "আমি তো তোমাকে তাই বললাম মা, আমি তো তোমাদের কেউ হই না! সেজন্যই দেশে চলে যেতে চেয়েছিলাম তো! কিছু দোষ করেছি কি?"

জয়তি ফের ফুঁসে উঠল, "দোষ করিসনি? আবার মুখে-মুখে কথা বলছিস! এইটুকু বয়স থেকে এ বাড়িতে আছিস, তোর মায়াদয়া নেই! দেশের বাড়িতে তোর কে আছে শুনি! আর তোর ওই কাকা, সে কেমন লোক তুই কি জানিস? তোকে নিয়ে গিয়ে যে বিক্রি করে দেবে না তারই-বা ঠিক কি?"

রজত অবাক হয়ে বলে, "বিক্রি করে দেবে? বিক্রি করবে কেন?"

"ফের মুখে-মুখে কথা! কত ছোট ছেলেকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে জানিস?"

"পবনচাচাকে যে আমি চিনি, আমাদের গড়িয়ার বাসায় একবার এসে কয়েকদিন ছিল।"

"এখন কাকা খুব আপনার জন হয়েছে, না! আমরা ভেসে গেছি বুঝি?"

"তা কেন হবে? কিন্তু আমি তা হলে কোথায় যাব?"

জয়তি এবার গনগনে চোখে চেয়ে বললেন, "যাওয়ার নাম করলে আমি তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব!"

সোজা-সরল হলেও রজত বোধ হয় একটু-একটু করে বুঝতে পারছিল এটা জয়তির রাগ নয়। রাগ তো ঠিক এরকম হয় না! সে একটু চুপ থেকে বলল, "আমি তা হলে কী করব বলো।"

"কোথাও যেতে পারবি না। আমার কাছে থাকবি।"

রজত একটু গুম হয়ে রইল।

জয়তি ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল, "আমাকে ছুঁয়ে বল। নইলে কিন্তু আমি উপোস করে থাকব।"

রজতের চোখ ছলছল করছিল, বাড়ানো হাতটা দু'হাতে ধরে বলল, "আমি যাব না মা, তুমি এখন খাও।"

সেই ছেলে এখন ছ'ফুটের ওপর লম্বা, মজবুত গড়ন। তেমন চোখা চালাক বা স্মার্ট নয়। ধীরস্থির, ভালমানুষ গোছের। লেখাপড়ায় তেমন ভাল কিছু নয়। পাশ কোর্সে বি কম পাশ করে বসে আছে। তবে সে এখন সত্যচরণ আর জয়তির প্রেশার মাপতে পারে, গ্লুকোমিটারে ব্লাডশুগারের হিসেব নেয়, জয়তির অক্সিজেনে কমা-বাড়ার দিকে খেয়াল রাখে অক্সিমিটারে। রাজু ছাড়া জয়তির এক মুহূর্তও চলে না। বয়সের হিসেব করলে

রজত তাঁদের ছেলের বয়সি নয়, নাতির বয়সি। দুনিয়ায় কত রকমের সম্পর্ক যে রচিত হয়ে যায়, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। রজতের পরিচয় দিতে হলে জয়তি এখন নির্দ্বিধায় লোককে বলে, এই তো আমার ছোট ছেলে রাজু।

২

সব শালা ডিসপোজেবল বডি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু রংবাজ কেউ কম নয়। আর-একটু হলেই বুলটন খুনটা করেই ফেলেছিল। তার ভিকটিম একেবারে অন্তিম সময়ে একটা প্যাঁচ মেরে বেরিয়ে গেল। তার ছোট্ট কালার টিভিটা যে নড়বড়ে টেবিলটার ওপর রাখা, তার আড়াল থেকে একবার যেন মুখটা বের করে বাঁ চোখটা টিপে তাকে টন্ট করেও গেল মনে হয়। তবে সেটা চোখের বা মনের ভুলও হতে পারে। খেলার মাঠের যেমন জার্সি আছে তেমনই তাদেরও মার্কামারা জার্সি আছে। হাফ-প্যান্ট, হাফ-হাতা গেঞ্জি আর কোমরে প্যাঁচ দেওয়া গামছা। পায়ে হাওয়াই, পকেটে মোবাইল আর দু'-পাঁচটা টাকা। আজ গ্রিন ভ্যালির কে একজন হারাধন নায়েকের বডি ডেসপ্যাচ করার আছে। আজকাল একটা সুবিধে হল বডি ঘাড়ে করে অত দূর টানতে হয় না। কাচের গাড়ি আছে, খোলা ভ্যান আছে, বডি নামিয়ে তাতে তুলে দাও, তারপর ট্যাক্সিতে ফলো, শ্মশানে ফের নামিয়ে ডোমের জিম্মা করে দাও। হয়ে গেল। বডি তন্দুরে যখন ঝলসাচ্ছে তখন রেস্তরাঁয় বসে মাংস পরোটা সাঁটাও। সব রুটিন।

পোশাকটা পরে নিয়ে কোমরে গামছাটা টাইট করে বেঁধে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চিকুকে আরও একবার খুঁজল বুলটন। শালার মেগা আই কিউ। ইঁদুর মারার বিষ আলুর চপের সঙ্গে মেখে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে রেখেছে, আঠামাখানো কাগজ দিয়ে ধরার চেষ্টা করেছে। পারেনি। হেভি চালাক। দিনের বেলা বড় একটা দেখা যায় না, রাতের বেলা চিক চিক করে চিল্লামিল্লি মাচায়। সেই জন্যই বুলটন নাম দিয়েছে চিকু। এখন এই একটাই আছে। বুলটন বিড়বিড় করে বলল, "তুই তো আর অমর নয়। মরবি, একদিন মরবিই।" আজ কাপড় কাচার মুগুরটা অব্যর্থ হাঁকড়েছিল বুলটন, শালা কী করে পিছলে মারাদোনার মতো বেরিয়ে গেল কে জানে!

বান্টিদা বলেছে, এখন কিছুদিন সোশ্যাল ওয়ার্ক করে যা। তারপর পলিটিকাল কাজে নামবি। বুলটনের অবশ্য পলিটিক্সে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। হেভি কমপিটিশন। তার ড্রিম হল, একটা বেশ ঝিনচাক বার-এ বাউন্সার হবে। ওঃ, বাউন্সারের মতো গ্ল্যামার আর কোথাও নেই। যতবার বার-এ যায় মুগ্ধ হয়ে সে শুধু বাউন্সারদের দেখে, কী পারসোনালিটি, কী ট্যাক্টফুল, কী ঠান্ডা মাথায় বজ্জাত বেহেড ব্যাদড়া কাস্টমারদের সামাল দেয়। বাউন্সার মানে তো আর গুন্ডামি নয়। ঝাড়পিট হলে কাস্টমার ভেগে যাবে, দোকানের বদনাম হবে। তাই মস্তানিটা করতে হয় এত চেপেচুপে যে, পাঁচজনে বুঝতে পারে না।

গ্রিন ভ্যালি হল বান্টিদারই প্রোমোট করা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সবাই জানে এখানে সাগরিকা নামে যে ম্যাডাম থাকেন, তিনি হচ্ছেন বান্টিদার দুই নম্বর। একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু দেখতে একদম ফিল্ম স্টারের মতো।

কাচে ঢাকা গাড়ি এসে গেছে। সুখেন, রজত আর গুড্ডু গাড়ির কাছেই দাঁড়ানো। তাকে দেখে সুখেন বলে, "বডি তিন তলা থেকে নামাতে হবে, বুঝলি। লিফ্‌ট খারাপ।"

"হারাধন নায়েক লোকটা কে রে?"

“হিস্টরি মে মিস্ট্রি হ্যায় দোস্ত। দু’মাস আগে বউ আর মেয়ে নিয়ে এসে কমল জানার ফাঁকা ফ্ল্যাটে উঠেছিল। শোনা যাচ্ছে বউটা ওর নয়। ভাগানো। মেয়েটাও। ও সব বান্টিদা বুঝবে। আমাদের কী?”

লম্বু হল মৌনীবাবা। কথাই কয় না, শুধু মিটিমিটি হাসে। এখন অবশ্য মুখে হাসি নেই। ভ্রু কুঁচকে ঘাড় উঁচু করে বিল্ডিংটা দেখছিল। যে-কোনও কারণেই হোক রাজুকে সবাই পছন্দ করে। বুলটন নিজেও। রাজুর দুটো প্লাস পয়েন্ট। হাইট আর পেটাই শরীর। কিন্তু সবাই জানে রাজু, জেন্টল জায়ান্ট রাজু একজন স্লো থিংকার, ওর রিফ্লেক্স কম, কোনও অ্যাগ্রেশন নেই, বলিয়ে- কইয়ে তো নয়ই।

পাশে দাঁড়িয়ে বুলটন বলে, “কী দেখছিস?”

রাজু ঘাড় ঘুরিয়ে বুলটনকে দেখে নিয়ে বলে, “কিছু নয়। এত বড় প্যাঁচা দেখা যায় না।”

“প্যাঁচা? কোথায় প্যাঁচা?”

“ওই তো, তিনতলার ওই ফ্ল্যাটটার বাথরুমের জানালায় বসে আছে।”

বুলটনের চোখ ভাল, তবু প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না। অনেকক্ষণ ঠাহর করার পর ধূসর রঙের পাখিটাকে দেখতে পেল বটে। দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল না।

“ওটা কার ফ্ল্যাট জানিস? প্যাঁচা নাকি খুব পয়া। লোকটার বরাত খুলে গেল হয়তো!”

রাজু একটু হাসল। বলল, “ওটাই কমল জানার ফ্ল্যাট।”

“যাঃ শালা, তা হলে তো উলটো কেস হয়ে গেল! ওটা বাথরুম কী করে বুঝলি? আগে এসেছিস?”

মাথা নেড়ে রাজু বলে, “না তো! অন্য জানালাগুলোর চেয়ে ওই জানালাটা ছোট তো, তাই মনে হল। পাখিটা রেয়ার। এখনও দিনের আলো আছে, অন্ধকার না হলে পাখিটা উড়েও যেতে পারবে না।”

গুড্ডু বান্টিদার খুব ক্লোজ়ড। ফোনটা ওর কাছেই এল। গুড্ডু ফোনটা পকেটে রেখে বলল, “চল, বান্টিদা ডাকছে। মালটা নামাতে হবে। স্ট্রেচারটা নিয়ে নে।”

তিনতলার ফ্ল্যাটে ঢুকতেই বড় ডাইনিং কাম ড্রয়িং। সোফাসেট-টেট আছে, যেমন থাকে। বান্টিদা সিঙ্গল সোফাটায় বসে আছে। মোটা মানুষ, থলথলে হাঁসফাঁস চেহারা, মাথায় ঘেঁস চুল, ঘন ভ্রু। ঘরে আর কেউ নেই।

বান্টিদা হাঁফধরা গলায় বলে, “ওই বাঁ দিকের বেডরুমে আছে।”

ছোটমতো বেডরুমে ডবল খাটে যে লোকটা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে সেও বেশ মোটাসোটা। পরনে সবুজ চেক লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি। মারা গেলে বাড়ির লোক একটু সাজিয়ে টাজিয়ে দেয়, সেটাই নিয়ম। হারাধনকে কেউ সাজায়নি, সেন্ট মাখায়নি, ফুলটুলও নেই। একা ঘরে পড়ে আছে গাড়লের মতো।

সুখেন চাপা গলায় বলে, “আরে, একটা দিন তো মানুষের একটু ভিআইপি ট্রিটমেন্ট জোটার কথা! হারুবাবুর তো শালা সেটাও জোটেনি দেখছি!”

তারা চটপট বডি নামিয়ে সামনের ঘরে এনে মেঝের ওপর রাখল। গুড্ডুই বান্টিদাকে জিজ্ঞেস করল, “বাড়ির লোক কে যাবে বান্টিদা?”

বুলটন লোকটাকে দেখছিল। ভিড়ের লোক। এত অর্ডিনারি চেহারা যে, একবার দেখলে মনে রাখা মুশকিল। যেমন ভিড়ে দেখা মুখ। একটু মোটা নাক, পুরু ঠোঁট, ছোট-ছোট চোখ, গায়ের রং মাঝারি, হাইট মাঝারি, কিছুই ইমপ্রেস করার মতো ছিল না হারাধন নায়েকের। বয়স পঞ্চাশ- টঞ্চাশ।

অন্য বেডরুমটা থেকে এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, হাতে একগোছা পাঁচশো টাকার নোট। রোগা, ফরসা, লম্বাটে মুখ। বেশ মিষ্টি চেহারা। টাকাগুলো গুড্ডুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "কিছু মনে কোরো না, আমার শরীর খুব খারাপ। বাড়িতে আর কেউ নেই যে শ্মশানে যাবে। যা করার তোমরাই করবে। এই টাকাগুলো রাখো, এতেই হয়ে যাবে বোধ হয়!"

বুলটনের আন্দাজ, কমসে কম কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা তো হবেই। টাকাগুলো বোধ হয় গুনে আনেনি, তা হলে পরিমাণটা মুখে বলে দিত। গুড্ডু একবার বান্টিদার মুখের দিকে চাইল আর বান্টিদা মাথা একটু নাড়া দিলেন। গুড্ডু টাকাগুলো হাফ-প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম। কিন্তু মুখাগ্নিটা কে করবে?"

"ওসব রিচুয়ালস আমরা মানি না। জাস্ট ক্রিমেট হিম।"

"ডেথ সার্টিফিকেটটা লাগবে ম্যাডাম।"

বান্টিদা তার বুকপকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে গুড্ডুর দিকে বাড়িয়ে বললেন, "এই নে, আমার কাছে আছে। আর শোন, আসার সময় ওটার দশ-বারোটা জেরক্স করে আনিস। লাগবে।"

"ঠিক আছে।"

কিছুই ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছিল না বুলটনের। ডেডবডি আনঅ্যাটেন্ডেড পড়ে আছে, নো সাজুগুজু, নো নাথিং, কান্নাকাটি বড় একটা হয় না আজকাল, কিন্তু এরা যেন হারাধনকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। আঠা যে ছিল না তা বোঝাই যাচ্ছে। বেচারা হারাধন! বুলটন হঠাৎ ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বলেই ফেলল, "একটা সাদা চাদর-টাদর হবে? তা হলে বডি ঢেকে নেওয়া যেত।"

ভদ্রমহিলা একটু যেন অবাক হলেন, "সাদা চাদর?"

এই সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে একজন স্বপ্নের মতো মেয়ে বেরিয়ে এল। রোগা, ফরসা, এলোথেলো বব চুল, সাজ নেই, তবু বুলটন এই প্রথম কাউকে দেখল যে রক্তমাংসের তৈরিই নয়। কী মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি, তা বোঝা যাচ্ছে না। দু'খানা বিশাল চোখ ঠিক কালো নয়, একটু নীলচে, চুলের রং মধুর মতো। আর, হেঁটে এল না ভেসে এল তা বোঝাই গেল না। পরনে একটা সাদা, লম্বা ঝুলের পা পর্যন্ত ঢাকা গাউনের মতো কিছু। হাতে একটা সাদা চাদর। সেটা গুড্ডুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "আপনারা প্লিজ় দেরি করবেন না। টেক হিম অ্যাওয়ে," ভ্রু কোঁচকানো, ঠোঁটে বিরক্তি, একটু হয়তো ঘেন্নাও।

তারা একটু ব্যোমকে গেছে সন্দেহ নেই। গুড্ডু চাদরটা ক্যাচ করে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই যাচ্ছি।"

মেয়েটা ফের বলল, "প্লিজ়!"

তারপর ঠিক চলন্ত একটা মোমবাতির মতোই আবার ভাসন্ত পায়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

বডি নীচে নামিয়ে কাচের গাড়িতে তুলে দিল তারা।

শেষমুহূর্তে হারাধনের একটা সাদা চাদর অন্তত জুটেছে। ডেডবডি দেখলেই লোকজন উঁকিঝুঁকি দেয়। দিচ্ছিলও। একজন বুড়ো মানুষ জিজ্ঞেসও করল, "কে গেল?"

কেউ জবাব দিচ্ছিল না দেখে বুলটন বলল, "একজন ফালতু লোক দাদু, নন এনটিটি, এই আমাদের মতোই।"

ট্যাক্সিতে উঠলে রাজু সবসময়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে। কারণ, লম্বা বলে ওর লেগরুম বেশি লাগে। পিছনে সুখেন, গুড্ডু আর বুলটন। বুলটন বলল, "মেয়েটাকে দেখলি?"

সুখেন বলে, "হাইফাই।"

গুড্ডু টাকা গুনছিল। বলল, "ওর নাম ইলিনা, লা মার্টে পড়ে।"

বুলটন বলে, "পাড়ায় বা রাস্তাঘাটে দেখিনি তো!"

"গাড়িতে যায় আসে। বাড়ি থেকে বেরোয় না।"

হঠাৎ সামনে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে রাজু বলে, "ডেথ সার্টিফিকেটে কী লিখেছে রে গুড্ডু?"

গুড্ডু বলে, "দেখার সময় পেয়েছি নাকি! দেখে বলছি দাঁড়া!" পকেট থেকে কাগজটা বের করে চোখ বুলিয়ে বলল, "কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ডিউ টু ম্যাসিভ কনভালশন। কে জানে কী! জিজ্ঞেস করলি কেন?"

"এমনি।"

রাজু আর কথা বলল না। গুড্ডু বলল, "থার্টি টু থাউজ্যান্ড আছে। এত দিল কেন বল তো!"

সুখেন চোখ বড় বড় করে বলে, "বাপ রে! এ তো জ্যাকপট!"

বুলটন বলল, "পরে আবার হিসেব না চায়!"

গুড্ডু বলে, "দূর, ওদের কি টাকার লেখাজোখা আছে নাকি!"

"বড়লোক?"

"তাই তো শুনেছি।"

"বড়লোক তো ভাড়াবাড়িতে আছে কেন! আর লুঙ্গি পরেই-বা শ্মশানে যেতে হচ্ছে কেন?"

"বান্টিদার কাছে শুনেছি বালিগঞ্জ প্লেসে ভদ্রলোকের বাড়ি, আর সেটা রিনোভেট হচ্ছে, তাই এখানে শিফ্‌ট করেছিল। বান্টিদার অ্যারেঞ্জমেন্টে। বাকিটা নো আইডিয়া।"

কেওড়াতলায় প্যারাফার্নেলিয়া অনেক। দু'ঘণ্টার ওপর লেগে গেল বডি চুলোয় ঢোকাতে। হয়ে গেছে কি না জানতে বান্টিদা বার চারেক ফোন করেছেন গুড্ডুকে। অবশেষে তারা হাঁফ ছেড়ে রেস্তরাঁয় এসে বসল।

বুলটন জিজ্ঞেস করল, "অস্থি-ফস্থি নিতে হবে নাকি?"

গুড্ডু মাথা নেড়ে বলে, "আরে না। ওরা ওসব মানে না তো বললই।"

বুলটন বারবারই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে। চোখে সেই থেকে লটকে আছে। ইলিনা। মেয়েটাকে রিয়েল বলে ভাবতেই পারছে না। মনে হয় এ মেয়ের শরীরে ঘামের গন্ধ হয় না, ঋতুমতীও হয় না, ছোটবাইরে বড়বাইরেও নেই, পরি-টরি যেমন আর কী। ডাইমেনশনটাই আলাদা। তিন জনের জন্য পরোটা মাংসের অর্ডার দিল গুড্ডু। রাজু শ্মশানে এলে খায় না। পিউরিটান আছে। টাকার হিস্‌সাও নেবে না। খরচখরচা বাদ দিয়ে ওই টাকাটা তিন ভাগ হবে। গুড্ডু, সুখেন আর সে। তাদের মধ্যে রাজুটাই একটু অন্যরকম। কেমন যেন। মাঝে-মাঝে সে রাজুকে বলে, "তুই কি শালা আমাদের বিবেক নাকি?"

রাজু শুধু হাসে। শালার পেট থেকে কথাই বের করা যায় না।

গুড্ডু একটা ছোট নোটবুকে টাকার হিসেব করছিল। পাইপয়সা অবধি হিসেব করে গুড্ডু, কখনও বন্ধুর সঙ্গে দু'নম্বরি করেনি, মদ খেয়েও না। টাকাপয়সার ব্যাপারে ওকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করা যায়। গুড্ডুর

পলিটিকাল অ্যাম্বিশন আছে। ওর একটাই টার্গেট, এমএলএ হওয়া আর বুলটন জানে একদিন এমএলএ ও হবেও।

রাজু আজ একটু আলগোছ, কী যেন ভাবছে। বুলটন ওর পেটে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, "কী এত ভাবছিস!"

রাজু মৃদু মৃদু হেসে বলে, "তেমন কিছু নয়, তবে এটা কিন্তু পুলিশ কেস ছিল।"

বুলটন অবাক হয়ে বলে, "কোনটা?"

গুড্ডু তার লেখা, আর সুখেন টেবিলের ওপর তার মৃদু তবলা থামিয়ে তাকাল।

রাজু একটু লজ্জা পেয়ে বলে, "মনে হল, তাই বললাম। হারাধনবাবুর ঠোঁট দুটো আমার নীল লাগছিল, আর মুখে বাবল ফর্ম করেছিল।"

গুড্ডু বলল, "যাঃ! কী যে বলিস! বান্টিদা আছে না! তার ওপর হারাধন বান্টিদার পুরনো বন্ধু। ফাউল প্লে হলে বান্টিদা কি ছেড়ে দেবে?"

"ফাউল প্লে নয়। সুইসাইড হতে পারে।"

সুখেন হঠাৎ বলে, "আমারও কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে একটু ডাউট আছে। ভদ্রমহিলার নাম কী রে গুড্ডু?"

"তামসী নায়েক।"

"নায়েক! ঠিক জানিস নায়েক?"

গুড্ডু মাথা নেড়ে বলে, "আই অ্যাম নট শিয়োর। পদবি কী লেখে জানি না।"

"তামসী ম্যাডাম আর ইলিনা, বডি তাড়াতাড়ি বের করে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর হারাধনের ঠোটের নীল রংটা আমারও চোখে পড়েছে।"

গুড্ডু ফের মন দিয়ে হিসেব করছিল। মাথা না তুলেই বলল, "বডি ছাই হয়ে গেছে, এখন আর এসব কথা তুলে লাভ কী? চেপে যা। কথাটা ছড়ালে ইমেজ খারাপ হবে।"

বুলটন জানে, গুড্ডু ইমেজ সম্পর্কে ভীষণ সেনসিটিভ। ভাবী এমএলএ তো!

সুখেনের জগৎটা তবলাময়। বাজায় ভাল। ফাংশনে ডাক পায়। অল্পস্বল্প রোজগারও হচ্ছে আজকাল। মণীশ ঘোষ নামে এক ওস্তাদের কাছে তালিম নেয়। কিন্তু চারদিকে গানবাজনার লোক এত বেড়ে গেছে যে, জায়গা করাই মুশকিল। সুখেন ফের টেবিলে তবলার বোল তুলতে তুলতে বলল, "না, রাজু বলল বলে বললাম। তবে একটা কথা বলি। তামসী ম্যাডাম আর ইলিনার সঙ্গে এই হারাধন লোকটা কিন্তু যায় না। ওরা হেভি অ্যারিস্টোক্র্যাট, আর এ লোকটা অর্ডিনারি। টাকা থাকলেই তো হল না, সরাফৎ ভি কোই চিজ় হ্যায়।"

গুড্ডু নোটবইটা বন্ধ করে পকেটে রেখে বলল, "আমাদের শেয়ার পড়ছে আট হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা করে বুঝলি?"

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। গুড্ডুর হিসেব খুব পাকা।

গরম মাংস আর পরোটা এসে গেল আর বাতাসটা যেন পলকে সুগন্ধী হয়ে উঠল। এরা বানায় খুব ভাল। শ্মশানের রেস্তরাঁর তো কোনও পেডিগ্রি নেই, কাস্টমারও সব প্রলেতারিয়েত। কিন্তু রেসিপিতে অনেককেই টেক্কা দেবে। বুলটন বলল, "এত বেশি টাকা দেওয়াটাও সন্দেহজনক। গুনে-গেঁথে হিসেব করেও দেয়নি, যেন

খামছে যা হাতে উঠেছে তাই দিয়ে দিয়েছে। তাড়াহুড়ো করে, যেন বিদায় করতে পারলে বাঁচে। মেয়েটা কী বলল শুনলি না, আপনারা প্লিজ় দেরি করবেন না। টেক হিম অ্যাওয়ে।"

গুড্ডু ভ্রু তুলে বলে, "আরে ভাই, তোরা কি মার্ডার মিস্ট্রি বানিয়ে ফেলবি নাকি? মেয়েটা তো ম্যাডামের আগের পক্ষের আর ম্যাডাম হারাধনবাবুর সঙ্গে লিভ টুগেদার করছিলেন। এরকমই তো হওয়ার কথা, আঠা থাকার তো কথাই নয়।"

রাজু মৃদু গলায় বলল, "দে ওয়্যার নার্ভাস।"

গুড্ডু বলে, "আচমকা ঘটনায় নার্ভাস তো হওয়ারই কথা, তাই না?"

সুখেন বলে, "আমার তো মনে হল, মা আর মেয়ে ডেডবডিটা নিয়ে টেনশনে ছিল। ডিসপোজ় অফ করতে পারলে বাঁচে।"

গুড্ডু বলল, "খামোখা ঘেঁটে লাভ নেই, ডেডবডি সম্পর্কে অনেকেরই রিপালশন থাকে।"

বুলটন হঠাৎ বলে, "ডাক্তারটা কে রে গুড্ডু? পাড়ার কেউ?"

গুড্ডু মাথা নেড়ে বলে, "চিনি না। জে রায়, ব্রড স্ট্রিটে চেম্বার।"

"পাড়ায় তো কত ভাল ডাক্তার আছে, অত দূর থেকে ডাক্তার আনতে হল কেন?"

"প্লিজ়, তোরা গোয়েন্দাগিরিটা একটু বন্ধ করবি? ভুলে যাস না এটাতে বান্টিদাও ইনভলভড। আমাদের বডি খালাস করার দায়িত্ব ছিল, করে দিয়েছি।"

বুলটন বিরক্ত গলায় বলে, "তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন, আমরা তো পুলিশের কাছে যাচ্ছি না। বডি হাওয়া হয়ে গেছে, কাজেই গিয়ে লাভও নেই। আমরা তো নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করছি। তা ছাড়া হারাধন নায়েক আমাদের কে যে, আমরা তার জন্য থানা-পুলিশ করব!"

গুড্ডু নরম হয়ে বলে, "আমিও সেটাই বলছি। ঠিক আছে আমি মানছি যে, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই। এই রাজুটাই যত নষ্টের গোড়া। তুই ফট করে এক একটা এমন কমেন্ট করে বসিস যে, প্রবলেম হয়ে যায়। হারাধনের ঠোঁট লাল না নীল তা তোর দেখার দরকারটা কী ছিল! আমরা তো আর ইনভেস্টিগেশন করতে আসিনি।"

রাজু মৃদু একটু হাসল। তারপর নির্বিকার গলায় বলল, "চোখে পড়ে গেলে কী করব বল!"

সুখেন বলে, "ঠিক আছে, চল বাড়ি যাই।"

বুলটন কিছু বলল না। বান্টিদার কাছে তারও টিকি বাঁধা। সোনার তরী কমপ্লেক্সে সে যে সিকিওরিটি গার্ডের চাকরিটা পেয়েছে সেটা বান্টিদারই দেওয়া।

ফেরার সময়ে তারা একটু চুপচাপ, ছোটাছুটিতে টায়ার্ডও বটে, তার ওপর পেটে মাংস-পরোটা। ট্যাক্সি থেকে নামবার আগে শুধু রাজু হঠাৎ মৃদু গলায় বলল, "প্যাঁচাটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে উড়ে গেছে।"

রাতে সোনার তরী কমপ্লেক্সে ডিউটি দেওয়ার সময় তারও প্যাঁচাটার কথা মনে পড়ছিল। ধূসর রঙের মস্তবড় পাখি। সে কলকাতার বস্তির ছেলে, পাখি-টাখি আর ক'টাই-বা দেখেছে। পাখিটা ওই ফ্ল্যাটের জানালাতেই এসে বসেছিল কেন, যেই ফ্ল্যাটে আজ একটা লোক মারা গেছে এবং হয়তো সুইসাইড করে! জীবনটা মাঝে-মাঝে খুব মিস্টিরিয়াস বলে মনে হয় কিন্তু! আর ইলিনা মেয়েটা! এমন নয় যে, মেয়েটাকে তার

পছন্দ হয়ে গেছে। আসলে মেয়েটাকে তার রক্তমাংসের বলে মনেই হয়নি। যেন রূপকথার বই থেকে নেমে এসেছে।

রাতের ডিউটিটা আরামের। রাত বারোটার মধ্যেই রেসিডেন্টরা ফিরে আসে, গেস্ট আসা কমে যায়। তার কাজ হল গেস্ট এলে খাতায় এন্ট্রি করা, যে ফ্ল্যাটে যেতে চায় সেখানে ফোন করে কনফার্ম করা। এটা নিশ্চয়ই বাউন্সারের মতো থ্রিলিং কাজ নয়। অ্যাডভেঞ্চার নেই। সোনার তরীর সেক্রেটারি সাধনবাবু প্রথম দিনই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ড্রিংক করো না তো!"

সে সভয়ে বলেছিল, "না স্যার।"

সাধনবাবু কঠিন চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, "প্রমাণ পেলে কিন্তু চাকরি যাবে। আর এই কমপ্লেক্সে অনেক ইয়ং মেয়ে থাকে, তাদের কারও কাছ থেকে যদি তোমার কোনও বেয়াদবির কমপ্লেন আসে, তা হলে শুধু চাকরিই যাবে না, পুলিশেও হ্যান্ডওভার করা হবে।"

সাধন গাঙ্গুলি নিজেই পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন, সদ্য রিটায়ার করেছেন। বুলটন ভাল ছেলের মতোই বলেছিল, "পাড়াতে আমার কোনও বদনাম নেই স্যার, খোঁজ নিয়ে দেখবেন।"

একসময়ে ব্যায়াম-ট্যায়াম করত বলে তার চেহারা ভাল। রাজুর মতো অতটা না হলেও সে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। বাউন্সার হবে বলেই সে চেহারা বানিয়েছে এবং এখনও মেনটেন করে। সাধনবাবু তার চেহারাটা দেখে খুব খুশি হলেন না বলেই মনে হল। তাকে আগাপাশতলা দেখে নিয়ে বললেন, "জিম করো নাকি?" সে সবিনয়ে বলেছিল, "এখন তো আর সময় পাই না। দুটো টিউশনি করতে হয়, জার্মান ল্যাঙ্গোয়েজ শিখতে যেতে হয়। সপ্তাহে চারদিন জিম করার সময় পাই।"

সাধনবাবু বিস্ময়ে ভ্রুটা ওপরে তুলে বললেন, "এডুকেশন কদ্দুর বলো তো!" বি কম পাশ শুনে ওঁর দুশ্চিন্তা যেন আরও একটু বাড়ল। বললেন, "তাই নাকি?"

বুলটনের একবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে, গ্র্যাজুয়েটেরা এখন রিকশাও চালায়। বলেনি, বেয়াদবি হয়ে যেত। মুশকিল হল সাধনবাবু ওল্ড টাইমার, ইয়ং মেয়েদের তার মতো ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে ছেলেদেরও যে বিপদ হয় সেটা বিশ্বাস করেন না। এই তো সিকিওরিটি গার্ডের চাকরি, কোনও গ্ল্যামার নেই, ভদ্রগোছের বেতনও পায় না, তবু কি ইশারা ইঙ্গিত হয় না?

সিদ্ধার্থ গুহ একজন নামী আর্কিটেক্ট, বি ব্লকে বড় ফ্ল্যাট। তার মেয়ে অবন্তিকার বয়স খুব বেশি হলে চোদ্দো-পনেরো, রোগা, ফচকে এবং ডেয়ারিং। প্রথম দিন থেকেই তাকে আড়ে-আড়ে দেখত। একটু-আধটু হাসত। একদিন সকালে ডিউটি করছিল বুলটন, লাল-সাদা স্কুল-ড্রেস পরা অবন্তিকা তার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "এই, দ্যাখো না, বইখাতা নিয়ে নিচু হতে পারছি না, আমার ডান পায়ের জুতোর ফিতেটা খুলে গেছে। প্লিজ়, একটু বেঁধে দেবে?"

এটা তার কাজ নয়, কিন্তু সে জানে রিফিউজ করলে মেয়েদের শোধ নেওয়ার অনেক পন্থা আছে। সুতরাং সে লক্ষ্মী ছেলের মতো হাঁটু গেড়ে বসে অবন্তিকার জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। মুখে একটা থ্যাঙ্ক ইউ বলল বটে, কিন্তু ঠোঁটের বিচ্ছু হাসিটায় অন্য কিছু ছিল। আর ছুতোনাতারও তো অভাব হয় না। এই যেমন একদিন রোববার হঠাৎ খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বলল, "এই, দ্যাখো না, আমার ফোনটা ভুল করে ফেলে এসেছি ঘরে। তোমার ফোনটা একটু দেবে? একটা জরুরি কল করতে হবে!"

দিতে হল। ফোনটা নিয়ে মুচকি হেসে পোর্টিকোর দিকে চলে গেল। একটু বাদে এসে ফেরত দিয়ে সেই বিচ্ছু হাসি হেসে থ্যাঙ্ক ইউ দিয়েই ফুড়ুৎ। পাঁচ মিনিট বাদেই তার কল, "অ্যাই, বলো তো আমি কে বলছি!" তারপর থেকে অবন্তিকার যখন-তখন ফোন, "এই শোনো না, একটু বাদে মা বেরিয়ে যাবে, আমি একা। চলে এসো না, দু'জনে অনেক গল্প করা যাবে!" কিংবা, "এই বোকা ছেলে, ছাদে আসবে? আমার তিনজন বন্ধু এসেছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" এসব কথা জানাজানি হলে সাধনবাবু তার চাকরি খেয়ে দেবেন। তাই ফাঁদে পা দেয়নি বুলটন।

আপার, মিডল বা লোয়ার যে-কোনও ক্লাসেরই হোক, সুন্দর, কুৎসিত বা চলনসই হোক, পাজি, চালাক, বোকা, ভালমানুষ বা যে রকমেরই হোক না কেন, চাইলে একটা মেয়ে জুটেই যায়। আজকাল প্রেম করাটাই সবচেয়ে সোজা কাজ। অলিতে-গলিতে বাসে ট্রেনে রেস্তরাঁয় পুজো প্যান্ডেলে মোবাইলে এত প্রেম যে, ভাইরাল অসুখ বলে মনে হয়। যুবক-যুবতীদের প্রেম ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে! প্রেম ফের ফুরিয়েও যায় প্রজাপতির আয়ুর মতো। বুলটন একসময়ে রোজ গীতা পড়ত, বিবেকানন্দ পড়ত, ব্রহ্মচর্য আর ধ্যান করারও চেষ্টা করেছে। তার মনে হয় মেয়েছেলে জীবনের কোনও টার্গেট হতে পারে না। তাই অনেক অফার থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের এই ব্যাপক সেল-এর বাজারে আজও তার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই।

ওই মাতাল রাঘববাবু এলেন। গেটম্যান মানস কুণ্ডু গেট খুলে দিল, একটা অ্যাপ ক্যাব ঢুকল ভিতরে। বুলটন ঘড়ি দেখল, রাত দেড়টা। এক-এক দিন রাঘববাবু নিজেই নেমে একটু আঁকাবাঁকা পায়ে এসে লিফট ধরে উঠেও যেতে পারেন। আবার কোনও কোনও দিন পেরে ওঠেন না। মানস গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে আজ হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল। বুলটন উঠে গেল গাড়িটার কাছে। আজ ডাউন। কেতড়ে আছেন, হাঁ করা মুখ থেকে লালা ঝরছে, চোখ ওলটানো। বুলটন জাপটে ধরে ছেঁচড়ে নামিয়ে এনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। প্রথমটায় পারছিলেন না, কয়েকবারের চেষ্টায় তার কাঁধে পুরো ওজনটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। এ সময়ে কিছু অর্গলমুক্ত কথা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, তার বেশির ভাগই গালাগাল, কাকে কে জানে। ছ'মাস আগে প্রথম যেদিন রাঘববাবুকে এভাবে তুলতে হয়েছিল চারতলার ফ্ল্যাটে, সেদিনকার কথা সহজে ভোলার নয়। সেদিনও রাঘব গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিলেন অস্পষ্ট উচ্চারণে। আর তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজানোর পর ভিতর থেকেও তেড়ে আসছিল নারীকণ্ঠের অশ্রাব্য গালাগাল, যেমনটা তারা বস্তিতে শুনতে পায়। শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে, বেশ্যার দালাল এবং অমুক ভাতারি, তমুক ভাতারি ইত্যাদি। দরজা খুলে যিনি দরজা জুড়ে দাঁড়ালেন তিনি একটু মোটাসোটা হলেও সুন্দরী এবং অভিজাত চেহারা। বুলটনের দিকে চেয়ে ফুটন্ত গলায় বললেন, "মাতালটাকে ওপরে এনেছ কেন? নীচে নিয়ে গিয়ে নর্দমায় ফেলে দাও।"

খুব ঘাবড়ে গিয়ে বুলটন যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখনই রাঘববাবু হঠাৎ তাকে ছেড়ে উবু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর পা থেকে একপাটি হাওয়াই চটি খুলে চটাস চটাস করে বেশ কয়েক ঘা বসালেন রাঘবের মাথা আর গালে। সঙ্গে গাটার ল্যাঙ্গোয়েজ। বুলটন ভয় খেয়ে পালিয়ে আসে। পরে জেনেছে রাঘব একটা মাঝারি মানের খবরের কাগজের ফিল্ম ক্রিটিক। গিন্নি বৈশালী বড়লোকের মেয়ে, তার ওপর নিজের বুটিকের ব্যাবসা আছে।

রাঘব যে নিজের পয়সায় মদ খান না এটা সবাই জানে। ফিল্ম ক্রিটিক আর খবরের কাগজের লোককে খাওয়ানোর লোকের অভাব হয় না। আর তাঁর চেনাজানাও অনেক। বুলটন বাউন্সার হতে চায় জেনে

বলেছিলেন, "দূর, ওটা আবার কোনও চাকরি নাকি? ওরা তো মাতালদের পকেট থেকে পয়সা সরায়।"

বুলটন দমে গিয়ে বলেছিল, "কিন্তু আমার যে খুব শখ।" তখন রাঘব ভরসা দিয়েছিল, "ঠিক আছে। দেখব। মাঝে-মাঝে মনে করিয়ে দিয়ো।"

আজও রাঘববাবুকে ওপরে নিয়ে গেল বুলটন। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ম্যাডাম এখনও গালাগাল দেন। তবে কম-বেশি আছে। এক-এক দিন কিছুই বলেন না। ইদানীং একটা অল্পবয়সি কাজের মেয়ে দরজা খুলছে। আজ তার হাতেই জিম্মা করে দিল বুলটন। দিন দুই দেখেছে মেয়েটাকে। মুখটা চেনা-চেনা। কারও সঙ্গে মুখের মিল আছে কি? ঠিক বুঝতে পারেনি বুলটন। রংটা কালোই, মাঝারি হাইট, লকলকে শরীর। রাঘববাবুকে দু'হাতে ধরে যখন ঘরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, তখন বুলটন হঠাৎ বলল, "আপনি বুলা মণ্ডল না?"

মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে বড়-বড় চোখে তার দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি আর কেউ নই।"

বুলটন তাজ্জব। কেউ নই মানেটা কী হল? দু'বছর আগে বুলা মণ্ডলের খুব নাম ছিল। দুশো আর চারশো মিটারে ন্যাশনালে রুপো আর ব্রোঞ্জ জিতেছিল। এত সব জানার কথা নয় বুলটনের। তাদের পাড়ার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব অ্যানুয়াল ফাংশনে কয়েকজনকে সংবর্ধনা দেয়। একজন উঠতি গায়ক, একজন বুড়ো কমেডিয়ান আর এই বুলা। বুলটনের পাশে ক্লাবের পুরনো মেম্বার প্রাক্তন ফুটবলার তপনদা বসেছিলেন। উনিই বলেছিলেন, দেখিস, এই মেয়েটা একদিন অলিম্পিকে যাবে। ক্লাব থেকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল বুলাকে। কৃতজ্ঞতা জানাতে উঠে বুলা একদম সাদামাটা ভাষায় ভণিতা না করে বলেছিল যে, তারা খুব গরিব। বাবা ভ্যান চালাত, এখন অসুস্থ হয়ে ঘরবসা, মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে সামান্য টাকা পায় বলে তাদের কোনওরকমে খাওয়া জোটে, দুটো ছোট বোন আছে যাদের একটার বেশি জামা নেই, বুলার নিজের ভাল রানিং বুট নেই, তার কোনও পুষ্টিকর খাবার জোটে না। রুপো আর ব্রোঞ্জ জেতার পর সে কিছু সাহায্য পেয়েছে বটে, কিন্তু তা বাবার চিকিৎসাতেই খরচ হয়ে গেছে। তার আরও টাকার দরকার, একটা চাকরির দরকার, নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কথাগুলো খুব মোচড় দিয়েছিল বুকের মধ্যে। তবে এ হল ঘর ঘরকা কহানি। তারপর বুলা ক্রমে আবছা হয়ে গেছে। কারণ, বুলা খবর হয়ে উঠতে পারেনি। তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার, সহজে মানুষের মুখ ভোলে না।

রাঘববাবুর সকালে উঠতে দেরি হয়। রোজ নয়, তবে মাঝে-মাঝে একটু বেলায় উনি বাজার করতে যান। তিনদিন বাদে একদিন ডে ডিউটির সময় বুলটন রাঘববাবুকে বাজারে বেরোতে দেখে সঙ্গ নিল, পাশে-পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

রাঘববাবু মাই ডিয়ার মানুষ, বিশেষ প্রোটোকল মানেন না, তা ছাড়া বুলটনের ওপর একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে। রোজ ছেলেটা ঘাড়ে করে তাঁকে তোলে। তার কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রেখে বললেন, "সেই বাউন্সারের চাকরির ব্যাপারটা তো?"

বুলটন বলে, "না স্যার, আমি একটা কথা জানতে চাইছিলাম। আপনার বাড়িতে যে নতুন কাজের মেয়েটা এসেছে ও কি বুলা মণ্ডল?"

রাঘব অবাক হয়ে বলেন, "তুমি কি বুলাকে চেনো?"

“না স্যার, তেমন চেনা নয়। তবে উনি ভাল স্প্রিন্টার ছিলেন বলে শুনেছি। আমাদের ক্লাবে ওকে একবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। তখন দেখেছি।”

“শুধু ভাল নয়, শি ওয়াজ জেম অফ আ স্প্রিন্টার। লেগে থাকলে অলিম্পিক বাঁধা ছিল। ন্যাচরাল অ্যাথলিট। কিন্তু ফেঁসে গেল বলে কেরিয়ার বরবাদ।”

“ফেঁসে গেল?”

“অভাবে স্বভাব নষ্ট হে! ওরা তিন বন্ধু ছিল, তিনজনেই স্প্রিন্টার। বাকি দু’জন অবশ্য বুলার ক্লাসের নয়। ওই তিনজনের টিম পরামর্শ করে শপ লিফটিং শুরু করেছিল। ওরা ভেবেছিল ভাল দৌড়োতে পারার সুবিধে নিয়ে চুরি করেই পালাতে পারবে, যদি ধরা পড়ার মতো অবস্থা হয়। তিন-চারটে কেস করেও ফেলেছিল। একটা বড় গয়নার দোকানে লিফট করে, সি সি টিভিতে মুখ আইডেন্টিফায়েড হয়ে যায়। পুলিশ তিনজনকেই তুলে নেয়। জেল থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু বদনাম হয়ে গেছে। আমি ফিল্ম ক্রিটিক হওয়ার আগে স্পোর্টসে ছিলাম। তখন থেকেই বুলাকে চিনি। অনেকের কাছে ধরনা দেওয়ার পর আমার কাছে আসে। আমি বাড়িতে নিয়ে এসেছি, বৈশালী বলেছে বুটিকের কাজ শিখিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবে।”

“স্যাড স্যার।”

“খুব স্যাড। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, সারাটা জীবন সামনে পড়ে আছে।”

রাঘববাবুকে গেট অবধি এগিয়ে দিয়ে ল্যান্ডিংয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল বুলটন। বুলা একদম বেরোয় না, দোকান-বাজারেও যায় না। দুপুরের দিকে রাঘব আর বৈশালী একসঙ্গেই বেরিয়ে যান। বুলা ওপরে একাই থাকে। হয়তো কাউকে মুখ দেখাতে চায় না।

৩

তার জানালার ধারেই একটা কদমগাছ আছে। এত কাছে যে, দোতলা থেকে হাত বাড়ালেই ডালপালা ছোঁয়া যায়। বর্ষায় যখন ঝেঁপে ফুল ফোটে, তখন মাঝে-মধ্যে এক-আধটা ফুল জানালা গলে ঘরের মধ্যেও উঁকি মারে। একদিন সকালবেলায় ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই নাকের ডগায় একটা সদ্য ফোটা ফুলকে ঝুলে থাকতে দেখে সে অবাক। ফুলটা যেন খুব কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে তাকে দেখছে। সে হেসে ফেলে বলে উঠেছিল, "হেল্লো! গুড মর্নিং!"

বর্ষা চলে গেছে। এখন ফুল নেই। গাছটা আছে, তাই জানালায় দাঁড়ালে রোজ এক সতেজ সবুজের সঙ্গে তার দেখা হয়। কখনও-সখনও একটু-আধটু কথাও হয় তাদের মধ্যে। গাছ আর সে। কত রকমের যে বন্ধু আছে চারদিকে, থই পায় না রাজু। তার তো গাছটাকে খুব বন্ধুর মতোই লাগে। শুনলে লোকে হয়তো পাগল বলবে, কিন্তু ঘরের ইনঅ্যানিমেটদের সঙ্গেও তার একটা বন্ধন আছে। ওরাও তাকে অনুভব করে, তাকে দেখে, শোনে এবং তার কথা ভাবেও। কী করবে সে? তার যে এরকমই সব মনে হয়!

আজ গাছটার দিকে সকালের আলোয় মায়াভরে চেয়ে ছিল রাজু। সামনের বছর গাছটা হয়তো আর থাকবে না। প্রোমোটারের সঙ্গে কথা চলছে, এই দোতলা বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে। সেই বাড়িতে তার নামেও একটা ফ্ল্যাট থাকবে। রাজুর এটা ন্যায্য মনে হয়নি। সে প্রবল আপত্তি করেছিল, কিন্তু বাবা আর মা কোনও কথা শুনতে চায়নি। বলেছে, "আমরা যখন থাকব না তখন তুই কোথায় যাবি?" বাবা বলেছিল, "তোকে তো দানখয়রাত করা হচ্ছে না। ধরমের কিছু টাকা তো আমার ব্যাবসায় এখনও খাটছে। এ তোর ন্যায্য পাওনা। তোর দাদা-দিদিও রাজি। তা হলে ফ্যাঁকড়া তুলছিস কেন?"

পাওনাগন্ডা ব্যাপারটা আজও ঠিক বোঝে না রাজু। তার অত বুদ্ধি নেই। সে স্লো থিংকার। সিদ্ধান্তে আসতে তার দেরি হয়, দেরিতে বোঝে বা অনেক সময়ে বুঝতেও পারে না। দুনিয়াটা যিনি রচনা করেছেন তিনি ভগবান-টগবান কেউ হবেন, কিন্তু রাজু আবার নিজের মতো করে তারও নিজের একটা দুনিয়া বানিয়ে নিয়েছে। সেই দুনিয়ায় হয়তো অনেক আজগুবি ব্যাপার আছে। সেই দুনিয়ায় রিয়েলিটির চেয়ে রূপকথা বেশি। জয়ীও সেই কথাই বলে, যারা ট্রুথকে ফেস করতে ভয় পায় তারাই ভারচুয়ালিটিতে পালায়। তাই হবে হয়তো।

জয়ী তার খুব ভাল বন্ধু। এ বাড়ির দুটো বাড়ি পরে ওদের বাড়ি, তারা একসঙ্গেই বড় হয়েছে। তারা বেশ কয়েকজন প্রায় সমবয়সি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলা করত। জয়ী তখন আলাদা কেউ ছিল না, অনেকের একজন। যখন তার বয়স বারো-তেরো আর জয়ীর আট বা নয় তখন রেললাইন পেরোতে গিয়ে পা মচকেছিল জয়ীর। জয়ী আদুরে মেয়ে, ভ্যাতকাঁদুনি, ব্যথাবেদনা সইতে পারত না। পা মচকে সে কী কান্না! রাজু জয়ীকে খানিক পাঁজাকোলে, খানিক ঘাড়ে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। সেই থেকে জয়ী একটু আলাদা হল, একটু বিশেষ। জয়ী বন্ধু ঠিকই, বয়সেও ছোট, কিন্তু বরাবর রাজুর সঙ্গে তার একটা দিদি-দিদি ভাব।

শাসন করে, ধমকায়, তাঁবে রাখে। জয়ীর বয়ফ্রেন্ড মনসিজ চৌধুরী, একজন এনার্জি এক্সপার্ট, নিউক্লিয়ার ফলআউটের ওপর পেপার করেছে। সে মাঝে-মাঝে জয়ীকে বলে, "আচ্ছা, রাজু কি তোমার প্রজা, না সাবোর্ডিনেট যে, সবসময়ে ওর সঙ্গে তুমি চোখ পাকিয়ে কথা বলো!"

জয়ী বলে, "তুমি তো জানো না, ওকে দাবড়ি না দিলেই ওর মাথায় ঘুঘুপাখি ডাকতে থাকবে। ভাল করে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো, ও কিন্তু এ জগতে নেই, ভাবের কুলুঙ্গিতে উঠে বসে আছে।"

জয়ী অর্থাৎ বিজয়িনী ঘোষ আর মনসিজ চৌধুরী বিয়ে করে বিদেশে চলে যাবে একদিন। খুব বেশি দেরিও নেই তার। তখন একটু একা হয়ে যাবে বটে রাজু। কিন্তু জীবনটা তো এরকমই। অন্তহীন পরিযাণ। শুধু গাছেরই কোথাও যাওয়ার নেই। গেলে ভাল হত। এই কদমগাছটা যেমন, কোথাও যেতে পারবে না বলে বেচারা কাটা পড়বে।

বিকেলে কোথায় যেন যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল জয়ী।

"তোকে একটা কথা বলার ছিল।"

"বল না! আমার বেরোতে দেরি আছে। মনসিজ ছ'টার আগে আসতে পারবে না।"

"কাল একটা ঘটনা ঘটেছে। তোকে না বললে অস্বস্তি হচ্ছে।"

"কী হয়েছে রে?"

চুপ করে সবটা শুনল জয়ী। মুখ গম্ভীর। তারপর বলল, "শোন, এসব কথা যেন কেউ টের না পায়। বান্টি দাস খুব ভাল লোক তো নয়! তোর মুখ খোলাই উচিত হয়নি। বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ বলে দেয়, তা হলে কী হবে বল তো! তুই এত বোকা কেন?"

"আরে, অত ভয় পাচ্ছিস কেন? জাস্ট একটা হান্চ। মার্ডার কেস তো নয়!"

"হতেও তো পারে। আচ্ছা একটা কথা বলবি, তুই তো সবসময়ে ভাবের ঘোরে থাকিস, কিন্তু তবু তোর অবজার্ভেশন এত শার্প হয় কী করে? তোর মনে আছে, আরত্রিকার বিয়ের দিন ছেলেপক্ষের লোকেদের মধ্যে একটা ভারী সুন্দর অল্পবয়সি মেয়েকে দেখে আমি বলেছিলাম, এই মেয়েটার সঙ্গে দাদার বিয়ে হলে দারুণ হবে। তুই তখন ফট করে বললি, মেয়েটা কিন্তু ম্যারেড। আমার বিশ্বাস হয়নি। সিঁদুর-টিঁদুর কিচ্ছু নেই, এত কম বয়স। তুই বললি, মেয়েটার বাঁ হাতে সোনায় লোহায় প্যাঁচানো নোয়া আছে। কিন্তু সেটা অত গয়নাগাঁটির মধ্যে চোখে পড়ারই নয়। পরে দেখলাম তোর কথাই ঠিক। এটা কী করে হয় বলবি? তুই তো শার্লক হোমস নোস।"

"আমার চোখে পড়ে গেলে কী করব!"

"ইলিনা কেমন দেখতে?"

"ভাল করে তো তাকাইনি। ইন ফ্যাক্ট তখন ডেডবডিটার ওপরেই অ্যাটেনশন ছিল। মনে হল মভ কালারের চুল, চোখদুটো ব্লুইশ, খুব ফরসা।"

"দেখতে সুন্দর?"

"হতে পারে।"

"বয়স কত?"

"স্কুলে পড়ে তো, কত আর হবে, ষোলো-সতেরো।"

"খুব সুন্দর?"

"কী করে বলি! আমি ওসব বুঝি না। তবে নাকের বাঁ পাশে একটা তিল ছিল বলে মনে হচ্ছে।"

"পরনে কী ছিল?"

"ড্রেস? একটা সাদা লং ফ্রক, পায়ে হাওয়াই চটি, হলুদ স্ট্র্যাপের।"

"তোর পছন্দ?"

"দূর, কী যে বলিস!"

"ভাল করে না দেখলে কি এত ডিটেলস বলতে পারতি? এমনকী, নাকের বাঁ দিকের তিলটা অবধি! তুই মেয়েটাকে হাঁ করে দেখেছিস! আর তোর পছন্দও হয়েছে।"

"বাজে বকিস না, আমি অত সহজে ঢলে পড়ি না।"

"কেন পড়িস না রে গাধা? এত রিপালশন ভাল নয়। এখন পর্যন্ত তোর একটাও গার্লফ্রেন্ড হল না। এর পর লোকে সন্দেহ করবে, তুই হোমো।"

"বাজে বকিস না। আমি বেশ আছি।"

"না, তুই মোটেই বেশ নেই। তোর একটা মেয়ে বন্ধু দরকার, না হলে তোকে গাইড করবে কে?"

রাজু অবাক হয়ে বলে, "গাইড! আমার আবার গাইডের কী দরকার পড়ল? তার ওপর আবার মেয়ে গাইড!"

"মেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল হয় বলে বলছি।"

"দ্যাখ জয়ী, আগে তুই এত মেয়ে ছিলি না, আজকাল দেখছি খুব মেয়েলি হয়েছিস।"

"আমি তো একটা মেয়েই। আগে কি পুরুষ ছিলাম?"

"তা বলিনি, আগে তুই এত জেন্ডার কনশাস ছিলি না, তাই তোর সঙ্গে আমার বনিবনা হত। এখন হয়েছিস, তাই তোর সঙ্গে আমার বনছে না।"

"যা, তা হলে কাট্টি দিয়ে দে। এখন যা তো, আমি ড্রেস চেঞ্জ করব।"

তাদের এরকমই হয়। নতুন ঘটনা কিছু নয়। আড়ি আর ভাব। আর শেষ অবধি রাজুকেই আপস করতে হয়। বরাবর হয়ে আসছে।

কচুবাটা, নিম-সজনে, সিংড়ি, তড়কা, শিষপালং, রাজমা বা ছানা-ভাপা হলেই রাজুকে ছুটতে হয় পদ্মামাসির বাড়িতে। পৌঁছে দিতে। জয়তির বড় মায়া, আহা রে, মানুষটা একা থাকে, কে-ই বা রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায়। আর পদ্মামাসির একটা লাখ টাকার হাসি আছে, রাজু গেলে যে হাসিটা হাসেন। সেটা দেখলে মোহর কুড়িয়ে পাওয়ার মতো একটা আনন্দ হয় রাজুর।

পদ্মামাসির সব কিছু টিপটপ, সাজানো-গোছানো, কোথাও কোনও বেগোছ বা বিশৃঙ্খলা নেই। যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানটাতেই আছে আবহমান। অদ্ভুত।

"আমার কী মনে হয় জানিস, তোকে গ্রে রংটা বেশ মানাবে। হাতেরটা শেষ হলে তোকে একটা সোয়েটার বুনে দেব, এই শীতেই পরতে পারবি।"

রাজু হেসে বলে, "তার আগে কলকাতার জন্য একটু শীতও তো বোনো। এখানে শীত কোথায় যে সোয়েটার চড়াব।"

"ওই দু'-চার দিন তো একটু পড়ে, তখন গায়ে দিবি।"

"তোমার আসলে বোনার নেশা। কাকে দেবে ঠিক করতে পারো না।"

"সে কথা ঠিক। সবজি ফিরি করতে আসে যে ইউসুফ, গতবার ওকেও তো একটা দিয়েছি। এত লজ্জা পেল, হাসিই বন্ধ হয় না। কী করব বল, সময় তো কাটে।"

এ বাড়িতে এলে দুধকফি বাঁধা। শুধুই দুধ এবং বেশ ঘন দুধ, কড়া মিষ্টি। জয়া জানে।

জয়ার মুখটা আজ গম্ভীর। রোজকার মতো মিষ্টি হাসিটা নেই তো আজ! কফিটা হাতে ধরিয়ে দিয়েই চলে গেল। অন্য দিনের মতো বলল না, ভাল তো রাজুদা?

রাজুর অনুসন্ধিৎসা আছে কিন্তু ছোঁকছোঁক করার অভ্যাস নেই। সে কিছু জানতে চাইলেও জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পায়। কফিটা ঠিক চার চুমুক খাওয়ার পর পদ্মামাসি খুব নিচু গলায় বললেন, "রতন তো তোর বন্ধু! তাই না?"

"হ্যাঁ তো! তবে আজকাল দেখা হয় না বড়-একটা। কেন বলো তো!"

"আর বলিস না। সে হঠাৎ করে জয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছে। মোটরবাইকে করে স্টেশন থেকে নিয়ে আসত, আবার রাতে পৌঁছেও দিত। এখন নাকি ফোনও বন্ধ। মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করছে। ঝগড়াঝাঁটিও নাকি হয়নি। তিন দিন হয়ে গেল।"

"তুমি চাইলে খোঁজ নিতে পারি। ও লাইনের ও-ধারে থাকে।"

"বাড়িতে নেই। গতকাল জয়া ওর বাড়িতে গিয়েছিল, রতনের মা বলে দিয়েছে, প্রেম করার সময় তো আমাকে বলে করোনি, এখন আমার কাছে এসেছ কেন? খুব ভেঙে পড়েছে মেয়েটা। ছেলেদের কাছে প্রেম মানে ফুর্তি, মেয়েদের কাছে তো তা নয়। তাদের কাছে অবলম্বন। সংসার হবে, নিরাপত্তা হবে, থিতু হবে, সংসার বাড়বে। কত কষ্ট করে টাকা জমিয়ে বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছিল, একটু একটু করে গয়নাগাঁটিও কিনছিল। ওর বাপটা তো ছুতোর, ভালই রোজগার করে, কিন্তু হাড়কেপ্পন। বলে দিয়েছে, প্রেমের বিয়ে তাতে আবার দানসামগ্রী কীসের? এখন কী যে হবে! একটু দেখিস তো বাবা খোঁজ নিয়ে!"

রাজু হাসল না বটে, তবে হাসি পাচ্ছিল। একটু নিরাসক্ত গলায় বলল, "মাসি, ব্রেক আপ তো এখন জলভাত। তুমি আপসেট হচ্ছ কেন? দু'দিন পরেই দেখবে, জয়া এই সিচুয়েশনে সেট হয়ে গেছে।"

পদ্মাবতী একটু হেসে বলেন, "সে জানি বাছা, তবে কান্নাকাটি দেখলে মনটা উতলা হয় তো! কী করব বল, আমরা তো পুরনো দিনের মানুষ!"

"তুমি কী করে পুরনো দিনের মানুষ হলে? তুমি তো বহাল তবিয়তে এই যুগেই রয়েছ, তোমার চারদিকেই তো কনটেম্পোরারি! তুমিও কনটেম্পোরারি। তা হলে মনটাকে পিছনে ফেলে রাখবে কেন? তুমি তো এই যুগেরও মানুষ!"

"কী জানি বাবা, তুই হয়তো ঠিক কথাই বলছিস, কিন্তু এখন যা সব হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না যে!"

"কেন পারবে না? প্রেজেন্ট টেন্সটাকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছ না বলেই পারছ না। তোমার ঘরজুড়ে বসে আছে পাস্ট টেন্স। বর্তমানটাকে ঢুকতে দাও, অতীতটা পালিয়ে যাবে।"

“ওরে ডাকাত, কী বলছিস, অতীত পালালে বাঁচব কী নিয়ে? পুরনো কথা ভেবেই তো মনটা ভরে থাকে। আর কী সম্বল আছে বল তো!”

“মাসি, আমার তো মনে হয় অতীত মানে ইতিহাস, আর ইতিহাসও কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। এগোয়, বদলে যায়। মানুষ বুড়ো হলে আর এগোতে চায় না, নিজের সময়টাকেও এগোতে দেয় না। কী মুশকিল বলো তো!”

পদ্মাবতী একটু লাজুক হেসে বলেন, “বয়স হলে ওরকমই সব হয় বোধ হয়। তবু তুই একটু দেখিস বাবা! এত ভাব ছিল দুজনের, হঠাৎ করে এমন কী হল কে জানে!”

সাইকেলের মতো এত ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। এত সহজ, জটিলতাহীন, ঝামেলাহীন আর কী-ই বা আছে দুনিয়ায়। দুটো চাকাসর্বস্ব, উদোম, ন্যাংটো, গরিব একটা গাড়ি। তবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এতে চেপে ইচ্ছে করলে দুনিয়া ঘুরে আসা যায়। রাজুর সঙ্গে তার সাইকেলের খুবই ভাবসাব। দু’জনের বোঝাপড়াও চমৎকার। সেই কবে থেকেই সাইকেল তার শরীরেরই একটা সংযোজন হয়ে আছে। তার মাঝে-মাঝে মনে হয় সাইকেল আর সে অবিভাজ্য। সাইকেলে দুনিয়া না হোক, সারা কলকাতাই ঘুরে বেড়ায় সে।

পার্ক স্ট্রিটের একটা পার্কিং লটে ফি কালেকশনের চাকরি করে রতন। জয়ার হিরো। বেলা সাড়ে এগারোটা, স্ল্যাক টাইম। একটা রোগা গাছের তলায় কৃপণ ছায়ায় মাথা বাঁচিয়ে চারটে থাক করা ইটের ওপর বসে ছিল। হাতে পার্কিং মিটার। তাকে দেখে খুশিয়াল হাসি হেসে বলল, “কোথায় বেরিয়েছিলি? চা খাবি? আয়, এখানে বোস,” বলে সরে একটু জায়গা করে দিল।

সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে একটু কেতরে রতনের পাশে বসল রাজু, “তোর প্রবলেমটা কী? নতুন কাউকে জুটিয়েছিস নাকি?”

“তোকে চুকলি কাটল কে? জয়া?”

“পদ্মামাসি।”

মোড়েই চায়ের গুমটি। রতন বলল, “আয়, আগে চা খাই।”

কী দারুণ চা! লিকার, দুধ আর চিনির এত ঠিকঠাক কম্বিনেশন আর্টের পর্যায়ে পড়ে। এ চা গ্র্যান্ডের বাবাও বানাতে পারবে না। গাছতলার সিংহাসনে ফের এসে বসল দু’জনে। রতন বলল, “খুব লোনলি লাগছে, কেন বল তো!”

“লোনলি?”

“হ্যাঁ। লোকজনের মধ্যে আছি, কথাটথাও হচ্ছে, কিন্তু একা ভাবটা যাচ্ছে না। প্রেম-ভালবাসা হচ্ছে, কিন্তু থ্রিল নেই। জয়া বকবক করে, আমিও জবাব দিই, কিন্তু কোনও ম্যাজিক নেই। কেমন গ্যাদগ্যাদে একটা ব্যাপার, বুঝলি! ঠিক ক্লিয়ার হল না তো! আমার কাছেও ক্লিয়ার নয়। প্রেম কে না করছে বল। সেই মান-অভিমান, সেই রেস্তরাঁবাজি, সেই বিয়ে, বাচ্চা। এক সিনারিও। মনে হল একটু ছুটকারা পাওয়া দরকার।”

“জয়াকে এসব বলেছিস নাকি?”

“ও বুঝবেই না। বলার একটু চেষ্টা করেছিলাম, কান্না জুড়ে দিল। কী হচ্ছে আমার বল তো! পেগলে যাব নাকি?”

“মনে হয় বোরডম।”

"তাই হবে। রোজ সকাল-বিকেল ডিউটি করার মতো প্রেম করতে আর ইচ্ছে করছে না। নতুন কথাও তো কিছু খুঁজে পাই না। এখনই যদি এরকম, তা হলে বিয়ের পর কী হবে বল তো!"

"জয়াকে বলে দিস, ইটস এ ব্রেক আপ।"

"আমার বলাটা ভাল দেখাবে না।"

"ফোনের সিম কার্ড চেঞ্জ করেছিস নাকি?"

"বাধ্য হয়ে। নইলে ফোনেই ঝালাপালা হয়ে যেতাম।"

"এখন তা হলে প্রেম-টেম নেই?"

"আছে।"

"আছে?"

"আগে আমি নন্দীবাবুদের গাড়ি চালাতাম। কড়েয়ায়। এখন সেখানেই আছি। এখন ওদের গাড়ি চালায় গণপত। সে সন্ধের পর চলে যায়। নন্দীবাবুর হার্ট ব্লক। যখন-তখন হসপিটালাইজ্‌ড করতে হতে পারে। তাই আমাকে মেডিক্যাল ইমার্জেন্সির জন্য রেখেছে। রাতে থাকতে হবে বলে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকতে দিয়েছে। বুঝলি! জীবনে টেক্সটের বাইরে রবিঠাকুর পড়িনি। মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটায় একটা বুক-শেলফে অনেক বই আছে। একদিন কী ইচ্ছে হল তাক থেকে একটা বই টেনে পড়তে বসে গেলাম। রবিঠাকুরের বলাকা। মাইরি, কিছুক্ষণ পড়ার পর নেশা ধরে গেল। তারপর একটার পর একটা বই। রবিঠাকুর, জীবনানন্দ আরও অনেকের কবিতা। মাতালের মতো অবস্থা। তারপর নিজেও কিনতে শুরু করি। ওই যে রাস্তার ওপারে বইয়ের দোকানটা দেখছিস, এক বুড়ো পারসির দোকান। আমার কবিতা পড়ার নেশা আছে জেনে বলল, ইংরেজি পড়তে পারো? বললাম, বি এ ক্লাসে তো পড়েছি, একটু-একটু পারি। বুড়ো আমাকে এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড পড়তে দিল। প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হত ঠিকই, মোবাইলের ডিকশনারিতে মানে দেখে নিতে হত। কিন্তু নেশার ঝোঁকে সব বাধা টপকে গেলাম। তারপর একদিন ঝোঁকের মাথায় একটা খাতা কিনে নিজেও বসে গেলাম কবিতা লিখতে। সেগুলো কিছু হয় না আমি জানি। আগামী একশো বছরেও আমি কবি হয়ে উঠতে পারব না। কথা তো সেটা নয়, আসল কথা হল আমি আমার মতো করে একটা কিছু ক্রিয়েট তো করছি। ওতেই অদ্ভুত একটা আনন্দ। ছাতামাথা যাই হোক, ছাপার অযোগ্য বা অপাঠ্য যাই হোক, অনর্গল ভিতরের চাপাপড়া কথারা বেরিয়ে তো আসছে।"

একটু চুপ করে থেকে রতন বলে, "তোর অবাক লাগছে তো!"

রাজুর অবাক লাগছিল না। বলল, "না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরকম হতেই পারে। কিন্তু বেচারা জয়া কী দোষ করল? তাকে ডিচ করলি কেন?"

"জয়া বিয়ের জন্য পাগল। এমনকী, গয়নাগাটিও কিনে ফেলেছে। আমার বয়স মাত্র তেইশ। বিয়ে একটা সিস্টেম, বিয়ে করলে একটা ফরমুলায় পা দিতে হয়। তেমন রোজগারও নেই। আর আমার এখন একটু স্পেসও দরকার। শুধু জয়াকে খুশি করতে বিয়েটা করতেই-বা যাব কেন বল তো! বোঝালে বুঝতে চায় না।"

"তা হলে তোর ভার্ডিক্ট জয়াকে কিন্তু জানিয়ে দেওয়া উচিত। বেচারার বোধ হয় এখনও এক্সপেক্টেশন আছে।"

“জানাব। এখন জানালে খুব শক লাগবে। ক'দিন যাক, আমার ইমেজটা যখন একটু ফিকে হয়ে যাবে ওর মনে, তখন জানিয়ে দেব।”

“তোর মোটরবাইকটা কোথায়?”

“বেচে দিয়েছি। ভাল অফার ছিল, তাই ঝেড়ে দিলাম। লোন ছিল, সেটাও শোধ করতে হল।”

রাজু একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, “ভাল। জয়া গেল, মোটরবাইকও গেল!”

“ভাবছিস কেন, সব আবার হবে, ইন গুড টাইম। টাইমটাই ফ্যাক্টর, বুঝলি! কী মনে হয় জানিস, ভালবাসা-টাসারও একটা সময় আছে। জয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও হয়েছিল ভুল সময়ে। আর কিছু করার ছিল না বলে প্রেম করতাম। ওটা প্রেম নয়, জাস্ট টাইম পাস। প্রেম বলে মনে হত।”

হারাধন নায়েক মারা যাওয়ার তিন দিনের মাথায় লোকটা এল। খয়াটে, খেঁকুড়ে চেহারা, শ্যামলা, ভাঙাচোরা শ্রীহীন লম্বাটে মুখ, মাথায় এক টোকা চুল আর তাতে তেল-সাবান পড়েনি অনেকদিন। চেহারা দেখলে ভক্তিশ্রদ্ধা হওয়ার কথা নয়। তবে চোখ দু'খানা বেশ শান দেওয়া, চোখা চাউনি। গায়ে ঢলঢলে একটা পাঁশুটে রঙের হাওয়াই শার্ট, পরনে কালচে রঙের ঢোলা প্যান্ট। হাতে একটা বাঁশের ডান্ডিওয়ালা ছাতা। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। বেলা সাড়ে দশটা হবে, কাজের মেয়ে সন্ধ্যা এসে খবর দিল, “তোমার কাছে কে একজন এসেছে, ভিতরে বসতে চাইল না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।”

রজত নীচে নেমে এসে লোকটাকে দেখল, না, তার কোনও চেনা লোক নয় তো!

“আমাকে খুঁজছিলেন?”

লোকটা ভারী বিনয়ের সঙ্গে হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল। তারপর বলল, “আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, আপনার সময় হবে কি?”

“কী কথা বলুন?”

“আমার নাম সমর বসু। আমি হারাধন নায়েকের বাল্যবন্ধু।”

“কে হারাধন নায়েক বলুন তো!”

“মনে না থাকা স্বাভাবিক, মনে রাখার মতো লোক তো ছিল না। গ্রিন ভ্যালিতে থাকত, দিন তিনেক হল মারা গেছে। আপনি এবং আপনার বন্ধুরা...”

ঝট করে মনে পড়ে গেল রাজুর। বলল, “ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। কী বলবেন বলুন। তবে আগেই বলে রাখি হারাধনবাবুর সঙ্গে আমার কিন্তু পরিচয় ছিল না। আমি শুধু ক্রিমেশনে ছিলাম, শ্মশানবন্ধু।”

লোকটা ভারী বিনয়ের সঙ্গেই বলল, “আজ্ঞে আমি তা জানি। তবে ওই বিষয়েই দু'-চারটে কথা ছিল। আপনার যদি এখন সময় না হয়, তা হলে আমি অন্য সময়েও আসতে পারি। আপনার যখন সময় হবে।”

রজত একটু ধাঁধায় পড়ে বলে, “কিন্তু হারাধনবাবুর বিষয়ে আমাকে বলে কি কোনও লাভ আছে?”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “আজ্ঞে না, সেরকম কোনও লাভ নেই বটে, না জানলেও কোনও ক্ষতি নেই। তবু আমার মনে হয়েছিল কথাগুলো কাউকে জানানো দরকার, এই আর কী। আমি কয়েকজনকে বলার চেষ্টা করেছিলাম, তবে আমাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কোনওদিনই দেয় না। তা হলে আসি? নমস্কার।”

রজতের মনে হল, এটা বড্ড অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। লোকটার ব্যবহারে একটা সত্যিকারের নম্রতা আছে, যেমনটা আজকাল দেখা যায় না। সে বলল, “আচ্ছা, আপনি আমার ঘরে আসুন।”

লোকটি ভারী খুশি হল। বলল, "আপনার যখনই শুনতে অনিচ্ছে হবে তখনই বলবেন, আমি বিদেয় হয়ে যাব।"

খুবই সংকোচের সঙ্গে প্রায় চোরের মতো সন্তর্পণে লোকটা তার পিছুপিছু ওপরে এল। পায়ের মলিন চটি জোড়া সিঁড়ির নীচেই খুলে রেখে এসেছে। ঘরে ঢুকল যেন ভিখিরি রাজপ্রাসাদে ঢুকছে। প্লাস্টিকের চেয়ারটায় জড়সড় হয়ে বসে বলল, "এত আপ্যায়ন আজকাল উটকো লোককে কেউ করে না।"

রাজু অবাক হয়ে বলে, "আমি আপ্যায়ন করলাম কোথায়?"

"এই যে ঘরে ডেকে আনলেন এটাই কি বড় কম কথা? ক'জন এটুকুও করে বলুন!"

রাজু হেসে ফেলে বলে, "আচ্ছা এবার বলুন তো কী বলতে চান?"

ছাতাটা দু'পায়ের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে হাতলে দু'হাতের ভর দিয়ে সমর বসু বললেন, "হারাধন যেদিন মারা যায় সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তারপরও আমি সারাক্ষণ আশপাশেই বিচরণ করেছি। আমার একটা সুবিধে হল আমি মশা-মাছির মতো একজন মানুষ বলে আমাকে লোকে লক্ষই করে না। এই আপনিই যেমন এখন কিছুতেই মনে করতে পারবেন না যে, আমি আপনাদের চারজন শববাহকের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছি। এমনকী আমি শ্মশানেও গেছি। বন্ধুদের চাপাচাপিতে আপনাকেই হারাধনের মুখাগ্নি করতে হয়েছিল তাও দেখলাম।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। পুরুত আমাকে মন্ত্রও পড়িয়েছে। একটা মিথ্যাচার হয়ে গেল। কে জানে লোকটার নিজেরও হয়তো ছেলে আছে।"

"আছে। দুটো। তবে খবর পেলেও তারা বাপের মুখাগ্নি করত কি না তাতে সন্দেহ আছে। হারাধনের ওপর তাদের খুব রাগ। তাদের কথা থাক। সেদিন আপনারা চারজন রেস্তরাঁয় বসেছিলেন। আমি পাশের টেবিলেই এক কাপ চা নিয়ে বসেছিলাম। আমি শুনলাম আপনি বলছেন, এটা কিন্তু পুলিশ কেস ছিল। মনে আছে?"

রাজু অবাক হয়ে বলে, "কী আশ্চর্য, সত্যিই তো আপনাকে দেখেছি বলে মনেই পড়ছে না।"

"আমাকে অনেকেই দেখে, কিন্তু পরে আর আমাকে কেউই মনে করতে পারে না। আর এই জন্যই আমি ক্রিমিনাল হলে হয়তো খুব সাকসেসফুল হতাম। এই আপনার কথাই ধরুন, আপনার অবজার্ভেশন সাংঘাতিক ভাল, আপনি তিনতলার জানালায় প্রায় অদৃশ্য একটা প্যাঁচাকেও লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু আমাকে লক্ষ করেননি। যাকগে, আসল কথাটা হল, আপনি খুব ভুল বলেননি। ওটা সত্যিই পুলিশ কেস ছিল।"

রাজু ভ্রু তুলে বলল, "তাই নাকি?"

"ওই চারজনের মধ্যে সেদিন আপনাকেই আমার সবচেয়ে বিচক্ষণ আর স্থিতধী মনে হয়েছিল। কারণ, মৃতদেহ দাহ হওয়ার আগে আপনি সন্দেহটা প্রকাশ করেননি। করলে এবং বিশেষ করে বান্টিবাবু টের পেলে মৃতদেহ আটক হতে পারত, অটোপসির দাবিও উঠতে পারত।"

"এটা কি মার্ডার কেস সমরবাবু?"

"আপনার স্নানাহারের সময় হলে বলবেন, আমি চলে যাব।"

"তার দেরি আছে। আপনি বলুন।"

"কিছু লোক জন্মগত রিপালসিভনেস নিয়েই জন্মায়। তারা হয়তো তেমন কিছু খারাপ লোক নয়, তবু লোকে তাকে বিনা কারণেই অপছন্দ করতে থাকে। এই আমি হলাম তার এক পাথুরে দৃষ্টান্ত। মায়েদের ভালবাসা কমপালসিভ তাই তাঁর কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু আমার বাবা এবং ভাইবোনেরাও আমাকে খুব একটা পছন্দ করত না। আমি যে মানুষের কতটা অপছন্দের লোক, তা টের পেলাম স্কুলে গিয়ে। ক্লাসে আমার সঙ্গে কেউই তেমন গল্পগাছা করত না। ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, সকলে যখন অফ ক্লাসে গল্প-টল্প করত, তখন কাঙালের মতো গিয়ে কাছটিতে বসে থাকতাম। আমার সঙ্গে হয়তো দু'-একটা কথা বলত, তারপরেই নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করত, আমার দিকে আর ফিরেও তাকাত না। কতজনের সঙ্গে কতভাবে ভাব করার চেষ্টা করেছি, ঘুষও দিয়েছি, ফাইফরমায়েশও খেটেছি, লাভ হয়নি। ঠাকুরের কাছে চোখের জল ফেলে প্রার্থনা করেছি, ঠাকুর, কেউ এক-দু'জন তো আমার বন্ধু হোক। হয়নি। বন্ধুহীন ওই বয়সটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। খেলাধুলো তেমন পারতাম না, লেখাপড়ায়ও ভাল নই, অন্য কোনও গুণও নেই। একা হওয়াই ভবিতব্য ছিল। এই দুঃসময়ে হঠাৎ ক্লাস সেভেনে হারাধন এসে ভর্তি হল। অন্য স্কুলে ডাব্বা মেরে এসে এই পচা স্কুলে ওপরের ক্লাসে অ্যাডমিশন পেয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম দিনই আমার পাশে বসল। আর কী আশ্চর্য, দু'-একদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। আমাকে মোটেই হ্যাটা করত না হারাধন। অনেক গল্প করত, স্কুলের পর দু'জনে প্রায়ই একসঙ্গে বেরিয়ে অনেক দূর পাশাপাশি হাঁটতাম। আমার ভয় হত, বুঝি স্বপ্ন দেখছি, এক্ষুনি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। সবেধন নীলমণি ওই একটা মাত্র বন্ধু পেয়ে আমি এত আত্মহারা যে, তার জন্য জীবন দিতে পারি। আমার বন্ধুক্ষুধা এতই তীব্র ছিল যে, আমি হারাধনকে পেয়ে তার অনুগতও হয়ে পড়তে থাকি। ঠিকঠাক বন্ধুত্ব হয়তো এরকম নয়, তাতে একটা সমান-সমান ভাব থাকে। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে আমি যে তার ক্রীতদাস হয়ে যাচ্ছি এটা টের পেয়েও আমার কিছু করার ছিল না। রাজুবাবু, আপনার স্নানাহারের সময় হলে বলবেন, ভদ্রতাবশে আমাকে প্রশ্রয় দেবেন না।"

"আরে না, এখন মাত্র সোয়া এগারোটা, আমি দুটোর আগে খাই না।"

"আমার বাচালতা অপছন্দ হলেও তা জানাতে দ্বিধা করবেন না।"

"আপনি বলুন।"

"আমার ভাগ্য বড়ই ভাল। কারণ, বি এ ক্লাসে পড়ার সময়েই আমি হঠাৎ ডাকঘরে পিয়নের চাকরি পেয়ে যাই, আমার এতবড় সৌভাগ্য আমি কল্পনাও করিনি কখনও। হারাধন আরও দু'বার ফেল মেরে ম্যাট্রিক পাশ করল টেনেমেনে। আমাকে বলল, জানিস তো, লেখাপড়া শিখে উন্নতি করতে গেলে বুড়োবয়স হয়ে যাবে। তাই সে শুরু করল ব্যাবসা। তার বাবার একটা ওষুধের ছোট দোকান ছিল, খুব ভাল চলত না। সে দোকানের ভার নিয়ে এক্সপ্যানশনের জন্য উঠেপড়ে লাগল। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া তো আছেই, তা ছাড়াও সে চোরাগোপ্তা ড্রাগেরও কারবার শুরু করে। আমি বরাবর তার বশংবদ। তার জন্য হেন কাজ নেই যা আমি পারি না। ড্রাগের কারবারেও সে আমাকে কাজে লাগায়। কারণ, আমি ডাকপিয়ন বলে আমার মুভমেন্ট সন্দেহজনক নয়। আমি তার ড্রাগ খদ্দেরদের কাছে অম্লানবদনে পৌঁছে দিয়েছি। দুনিয়ায় সে আমার একটিমাত্র বন্ধু, তাকে আমি কিছুতেই হারাতে চাইনি। তাকে খুশি করার জন্য নৈতিকতাও আমার চুলোয় গেল। অবশ্য তার ওষুধের কারবার ফুলেফেঁপে ওঠায় সে ড্রাগের কারবার বন্ধ করে দেয়। পুলিশও পিছনে লেগেছিল। আমার ডাকঘরের কাজ শেষ হলে সন্ধের সময় আমি তার ওষুধের দোকানে গিয়ে হিসেবপত্র দেখতাম।

পার্টটাইম হিসেবে। হারাধন তার জন্য আমাকে পয়সা দিত। না দিলেও আমি কাজটা করতাম। সে ক্রমশ অর্থবান হচ্ছে দেখে আমি বড় খুশি। তার আহ্লাদী বউ হল কমলিকা, বেশ ভালবাসাও ছিল তাদের মধ্যে। আমার মতো তো নয়।"

"আপনি বিয়ে করেননি?"

"করতে হয়েছে। তবে আমার মতো মানুষকে কোনও মেয়ের পক্ষে যে ভালবাসা সম্ভব নয়, তা আমি জানি। স্ত্রীলোকের প্রত্যঙ্গ ছাড়া আমাকে আমার স্ত্রীর আর কিছুই দেওয়ার ছিল না। আমার মতো লোকের তাইতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে হারাধন অল্পে খুশি হওয়ার লোক নয়। তার দোকানের সংখ্যা বাড়ল, টাকা বাড়ল, স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বাড়ল। নানারকম মেয়েমানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক হতে লাগল। ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও প্রবল অশান্তি। ছেলেরা বড় হচ্ছে, ব্যাপারটা তারাও বুঝতে পারছে। হারাধন আমাকে অনেক কথাই বলত, তার স্লোগান ছিল, পুরুষমানুষ কি একটা মেয়েমানুষে আটকে থাকতে পারে? তার সব কথাই আমার যুক্তিযুক্ত মনে হত। তার নারী মৃগয়ার ইতিহাস দীর্ঘ। সেটা ঘেঁটে কোনও লাভ নেই। বরং আসল কথায় আসি। আপনি খেয়াল করবেন আপনার স্নানাহারের সময় হল কি না। আমি ঝোঁকের মাথায় কথা বলে যাচ্ছি তো।"

"না, ঠিক আছে। আপনি বলুন।"

"যে আজ্ঞে। নীলাঞ্জন ঘোষ ছিলেন হোটেলিয়ার এবং ট্রাভেল এজেন্ট। ব্যবসায়িক সূত্রেই তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হারাধনের। তখন নীলাঞ্জনের অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে, ব্যাবসায় মন্দা। হারাধনের সঙ্গে তার কী চুক্তি হয়েছিল তা আমি জানি না, ওসব বড়-বড় ব্যাপার আমাকে বলতও না হারাধন। তবে নীলাঞ্জনের ব্যাবসায় টাকা ঢেলেছিল সে। অনেক টাকা। ব্যাবসা বাঁচল বটে, কিন্তু নীলাঞ্জন নয়। ডাক্তার রায় দিয়েছিল অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মৃত্যু। পিছনে কোনও রহস্য থাকলেও থাকতে পারে, আমার জানা নেই। মৃত্যুর পর দেখা গেল ব্যাবসার মালিকানা হাতবদল হয়ে গেছে। তা হারাধনের দখলে। নীলাঞ্জনের বউ-মেয়ের পথে বসার অবস্থা। হারাধন অবশ্য তখন বন্ধুর মতোই তাদের পাশে দাঁড়ায়। নীলাঞ্জনের স্ত্রী তামসী সুন্দরী। হারাধন আমাকে একদিন বলে, সে কমলিকাকে ত্যাগ করে তামসীকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চায়। ঘরে তুমুল অশান্তি শুরু হল। তিতিবিরক্ত হারাধন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং তামসীকে নিয়ে নতুন আস্তানায় ডেরা বাঁধল। হারাধনের কোনও সিদ্ধান্তকেই আমার ভুল বলে মনে হত না। সত্যিই তো, এতকাল বিবাহিত জীবন যাপন করার পর একঘেয়েমি তো আসতেই পারে। আমাদের না হয় উপায় নেই, কিন্তু যার উপায় আছে সে কেন পুরনো বন্ধনে পড়ে থাকতে যাবে! এখন দুনিয়ার ট্রেন্ড তো সেদিকেই। আপনি সময়ের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটলে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হবে।"

"মাত্র পৌনে বারোটা বাজছে। আপনার চিন্তা নেই।"

"আপনার অশেষ অনুগ্রহ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গ্রিন ভ্যালিতে নতুন জীবন শুরু হল হারাধনের। বউ আর ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক বিষাক্ত, তবে তার দুই ছেলেই সাবালক, ব্যবসায়িক পার্টনার। সুতরাং ছেলেদের সঙ্গে একটা ফর্মাল যোগাযোগ ছিল মাত্র। আর আমি ছিলাম দুই পরিবারের মধ্যে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র। আসলে আমি হারাধনের হয়ে আড়কাঠির কাজ করতাম। কমলিকা আর হারাধনের ডিভোর্সের মামলা চলছে, কমলিকা ডিভোর্স দিতে রাজি নয়, তাই কমলিকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানোর ভারও হারাধন আমাকে দিয়েছিল।

তাতে অবশ্য কাজ হত না। আমি তেমন কোনও কুশলী, বাকপটু লোক তো নই। আমি প্রায় রোজই গ্রিন ভ্যালিতে যেতাম। তামসী, কেন জানি না আমাকে পছন্দ করতেন। চা এবং সুস্বাদু বিস্কুট খাওয়াতেন। অনেক গল্পও করতেন। কিছুদিন পর আমি লক্ষ করি তামসী একটু গম্ভীর এবং চিন্তিত। মুখে উদ্বেগের ছাপ। সেইটা ক্রমে বাড়তে লাগল। হঠাৎ একদিন বললেন, আপনি মেয়েদের কোনও হস্টেলের খবর দিতে পারেন? আমি বললাম কার জন্য? উনি বললেন, ওঁর মেয়ের ওখানে অসুবিধে হচ্ছে। আমি অপদার্থ হলেও আমি কিছু জিনিসের গন্ধ পাই। কথাটা শোনামাত্র আমি বুঝলাম, ওঁর কিশোরী মেয়েটির প্রতি হারাধনের আগ্রহ জন্মেছে। মেয়েটিকে আপনিও দেখেছেন। আপনার কি মনে হয় না যে, মেয়েটির একটি এথেরিয়েল বিউটি আছে?"

"আমি অত বুঝি না, খুব ভাল করে দেখিওনি। তবে বোধ হয় চেহারাটা একটু অন্যরকম।"

"হ্যাঁ, অন্যরকমই বটে। নিষ্পাপ ভাল মেয়ে। হারাধনের মেয়ের মতোই। কিন্তু আদিম প্যাশনের কাছে পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্ক অনেক সময়ে খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। এই জন্যই অনেক সময়ে বালিকা বা কিশোরীরা তাদের বাবার কাছেও নিরাপদ নয়। খবরের কাগজে এরকম খবর আকছার পাওয়া যায়। আর এ তো রক্তের সম্পর্কও নয়। আমি তামসীকে বললাম, আপনি আমাকে অকপটে বলুন আপনার মেয়ের ঠিক কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। কারণ, কিছুদিন ধরেই আপনাকে আমি উদ্বিগ্ন দেখছি। আমাকে দুর্বল অপদার্থ ভেবে উপেক্ষা করবেন না, তা হলে মস্ত ভুল হবে। এ কথায় তামসী ভেঙে পড়লেন, কাঁদলেন এবং বললেন, কিছুদিন যাবৎ হারাধন প্রায়ই রাতে ড্রিংক করে এসে ইলিনাকে তার কাছে পাঠাতে হুকুম করছে। তারপর নিজেই গিয়ে ইলিনার দরজায় নক করছে। ছুটির দিনে ইলিনাকে ভাল রেস্তরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইছে ইত্যাদি। তাঁরা মা আর মেয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে আছেন এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাঁরা দু'জনেই কার্যত পণবন্দি। তাঁদের যাওয়ার জায়গা নেই, টাকাপয়সা নেই, বলভরসা নেই। শুনে আমার মনে হল, এরকম হওয়া উচিত নয়, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমি বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না। এর একটা বিহিত হবে। তবে আমার জানা দরকার হারাধনের কাছ থেকে মুক্তি পেলে আপনার সম্বল কী। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, তাঁর কোনও সম্বল নেই। শুধু তিনি শুনেছেন হারাধনের সঙ্গে তাঁর একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে আর তাতে নাকি পঞ্চাশ লক্ষ টাকাও আছে, কিন্তু চেকবই বা এটিএম কার্ড হারাধনের কাছে। হারাধন তাঁদের পিছনে দেদার খরচ করে বটে, কিন্তু ভাণ্ডার খুলে দেয় না। আমার অযোগ্যতা সীমাহীন। কিন্তু আমি কিছু কাজ খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে পারি। আমি বাড়ি ফিরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে রইলাম। আমাদের সকলের ভিতরেই একটি করে আদালত থাকে, আর বাইরে কিছু করে উঠতে না পারলেও আমাদের অভ্যন্তরীণ আদালতে আমরা নিত্যই নানা অপরাধীর বিচার করে শাস্তির বিধান দিই। সেই রাত্রে আমি জীবনে প্রথম হারাধনকে অপরাধী সাব্যস্ত করলাম। আপনি যে এতক্ষণ ধরে আমার কথা শুনছেন, তাতে আমি আপ্লুত, কিন্তু রজতবাবু, আপনার স্নানাহারের যে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে!"

"না তো, আপনি খুব বেশি সময় নেননি! এখন বারোটা মাত্র।"

"তবে বলি। এই সিদ্ধান্ত নিতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। পৃথিবীতে সে আমার একমাত্র বন্ধু। তার প্রতি আমার অন্ধ আনুগত্য। কিন্তু মনে হল, এর একটা শেষও থাকা দরকার। আপনি কি দাবা খেলা জানেন?"

"একটু আধটু।"

“দেখবেন, অনেক সময়ে প্রতিপক্ষের একটিমাত্র গুটির স্ট্র্যাটিজিক অবস্থান আপনার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সেই গুটিটা নড়ে গেলেই আবার আপনি নিরাপদ। হারাধন হল সেই গুটিটা। কঠিন সিদ্ধান্ত। আমি প্রথমেই হারাধনের কারেন্ট অ্যাকাউন্টের চেকবই থেকে একদম পিছনের দিককার একটা পাতা ছিঁড়ে নিলাম। হারাধনের সই আমি চোখ বুজেও হুবহু নকল করতে পারি। দুর্বলদের এইসব নৈপুণ্য থাকেই। একটা বড় অ্যামাউন্টের অঙ্ক বসিয়ে চেকটা তৈরি রাখলাম। তবে জমা দিলাম না। হারাধন নানা অসুখে ভুগত। ডায়াবিটিস, হাই প্রেশার, প্রস্টেট, থাইরয়েড, হাই কোলেস্টেরল, হার্টে ব্লকেজ ইত্যাদি। সে কোন কোন ওষুধ খায়, কখন খায় সব আমার মুখস্থ। সকালের দিকে সে যেসব ওষুধ খেত তার মধ্যে একটা খয়েরি রঙের ক্যাপসুল ছিল। আমি সেই ক্যাপসুলটাই বেছে নিই, দোকান থেকে সেটা তুলে নিতে কোনও কষ্ট নেই। কারণ, আমি তার দোকানেই কাজ করি। ব্লিস্টার স্ট্রিপ। ব্লিস্টারের দিকে শক্ত প্লাস্টিকটা নিপুণ ব্লেডের ছোঁয়ায় কেটে ক্যাপসুলটা বের করে ওষুধটা ফেলে দিয়ে অন্য একটা টক্সিন ভরে ক্যাপসুলটা আবার জুড়ে ব্লিস্টারে ভরে কাটা জায়গাটা কুইক সিল দিয়ে লাগিয়ে হারাধনের ওষুধের টেবিলের স্ট্রিপটার জায়গায় রেখে দিই। তারপর একটু অপেক্ষা। সে কবে ওই ক্যাপসুলটা খাবে তাও আমার হিসেব করা ছিল। সেদিন আমি ছুটি নিয়েই রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বিদ্রুপ করে মাঝে-মাঝে বলেন নেংটি ইঁদুর। বাস্তবিক আমি নিজের সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাই। মাটির কাছাকাছি ইঁদুরের অবস্থান, নানা রন্ধ্র, নানা অলিগলি সে চেনে। আমিও তাই। জয়শীল রায় একজন ভাঙাচোরা মানুষ, বারোমাস মানসিক অবসাদে ডুবে থাকেন, তাঁর বউ তাঁকে ছেড়ে তাঁরই এক বন্ধুর সঙ্গে চলে গেছে, প্র্যাকটিস নেই, ড্রাগের নেশা এবং বাজারে প্রচুর ধার। ডাক্তারি ডিগ্রিটা ছাড়া আর কিছুই নেই তাঁর। আমি মাঝে-মাঝেই তাঁর কাছে যাই। কারণ, ব্যর্থ হেরো মানুষদের আমার বড় আপনজন বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে যেন নিজেকেই খুঁজে পাই। ডেথ সার্টিফিকেটটা লেখার জন্য আমি তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলাম, যে টাকাটা হারাধন মারা যাওয়ার পর পরই আমি তার অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে আনি অবশ্যই সই জাল করে। এত সব করার পরেও মনে খুঁতখুঁতুনি ছিলই। ধরা পড়ে যাব না তো! ধরা পড়লেও আমার কিছুই হবে না আমি জানি। আমি সন্দেহের অতীত। কিন্তু হয়তো বিপদে পড়বেন তামসী আর তাঁর মেয়ে। আপনি হয়তো জানেন না, কমলিকা আর তার ছেলেরা ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে একটা খুনের অভিযোগ দায়েরও করেছে।”

রজত বিস্ফারিত চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে এই ছোটখাটো খেঁকুরে চেহারার লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য! এবার একটা বদ্ধ শ্বাস মোচন করে বলল, “আপনি সত্যি বলছেন!”

লোকটা হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে আমার কথাকে কেউই কখনও গুরুত্ব দেয়নি। আপনি না দিলেও ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল হারাধন, একমাত্র সেই আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করত না, আমার ওপর টানও ছিল খুব। বলত, শরীরের খেয়াল রাখিস। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করিস তো? যখন ক্যাপসুলটা হাতে নিয়েছে, বাঁ হাতে জলের গেলাস, তখনও কথা বলছিল আমার সঙ্গে। বলছিল, পুরনো বন্ধুরা কে কোথায় আছে বল তো, অনেকদিন কারও খোঁজ নেওয়া হয়নি। একমাত্র তুই ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা হয় না। আমার চোখে জল আসছিল, গলায় কান্নার দলা। একবার মনে হল বলি, ক্যাপসুলটা খাস না, ফেলে দে। বলা হল না। ক্যাপসুলটা গিলে ফেলার পর বলল, তোর মেয়ের তো বিয়ের বয়স হল, না? বিয়ে ঠিক হলে আমাকে বলিস। নেকলেস আর বেনারসিটা আমিই দেব। আমি বললাম, সে তো তুই অনেক আগে

থেকেই আমাকে বলে রেখেছিস। হেসে বলল, আজকাল অনেক কথা ভুলে যাই। বয়স হল নাকি রে! আমার কথা আটকে যাচ্ছিল, আমার সামনে তখন এক ভয়ংকর একাকিত্বের করাল ছায়া। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে। আমি একটু শুই। তুই দরজাটা টেনে দিয়ে যাস। আমার শোকের সময় ছিল না। অনেক কাজ বাকি, তাই চলে এলাম। দরজাটা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে।”

রজত চিন্তিত মুখে লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, “সমরবাবু, এসব কথা আমাকে জানানো কি ঠিক হল?”

“তা তো জানি না। কিন্তু এই যে আপনার কাছে সব কবুল করলাম, তাতে আমার মনোভার অনেক কমে গেছে। আপনাকে একজন স্থিতধী, বিবেচক এবং সুস্থির মানুষ বলে আমার মনে হয়। আপনার বয়স খুব কম, তবু আপনাকে অপরিণত বলে মনে হয় না। কমলিকা আর তার ছেলেরা খুনের অভিযোগ করেছে। পুলিশ হয়তো তদন্ত করবে। আপনি শ্মশানবন্ধু ছিলেন, কাজেই আপনাকেও হয়তো জেরা করা হবে। আমি শুধু বলতে চাই তামসী আর ইলিনা নির্দোষ। আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছি, মাপ করবেন। এবার আপনি স্নানাহার করুন।”

৪

সকালে ডিউটিটা ভাল লাগে না বুলটনের। বরং নাইট ডিউটি করলে সারা দিনটা সময় পাওয়া যায়, দিনে অনেক কিছু করার থাকে মানুষের। কাজ অবশ্য কিছুই না, ফালতু বসে থাকা আর মাছি তাড়ানো। আনপ্রোডাকটিভ লেবার। গালভরা নাম সিকিওরিটি গার্ড, আসলে পাতি বাংলায় চৌকিদার। চাকরির কোনও ওজন নেই, অ্যাডভেঞ্চার নেই, আর এ দেশে মানুষ সস্তা বলে যে যা খুশি বেতন ধরিয়ে দেয়। তাই হাত পেতে নিতে হয় বটে, কিন্তু মনটা গজরাতে থাকে। তার বাবা একটা তেলকলে চাকরি করে। নামকাওয়াস্তে তেলকল, আসলে সেটা মুরগি বরুণের ঘানি। ঘানির একটা পুরনো মেশিন আছে বটে, কিন্তু তা থেকে কেউ কখনও তেল বেরোতে দেখেনি। তবে মেশিনটায় পাছে মরচে ধরে যায়, সেই জন্য মাঝে-মাঝে চালানো হয়। আসলে বিক্রি হয় চালানি তেল। বোকা লোকেরা ভাবে ঘানির তেল কিনছে। কত রকমের যে দু'নম্বরি আছে চারদিকে! একটা চটি জার্মান টেক্সট বই পড়ার চেষ্টা করছিল সে প্লাস্টিকের চেয়ারটায় বসে।

"এই, শোনো!"

বুলটন বইটা সরিয়ে দেখে সামনে বুলা। সে টপ করে দাঁড়িয়ে বলল, "কিছু বলছেন?"

বুলা বিপন্ন গলায় বলে, "এই, দ্যাখো না, আমাদের তিনতলার বাথরুমে জল আটকে যাচ্ছে। পাইপে জ্যাম হয়েছে বলে মনে হয়। এ বাড়ির প্লাম্বারকে ডাকতে হবে। আমি তো নতুন এসেছি, কিছু জানি না।"

বুলটন বলে, "প্লাম্বার সঞ্জয় জেনা। আমি ফোন করে দিচ্ছি, এসে যাবে।"

"আচ্ছা, তুমিই কি বুলটন? বাবাকে মাঝে-মাঝে ওপরে তুলে দাও?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, আর আমিও আপনাকে চিনি।"

"আমাকে আপনি করে বলছ কেন?"

"এমনি, আপনি এসে গেল।"

বুলা একটু হাসল। বলল, "আমাকে এখন কেউ চেনে না।"

"আমি চিনি ম্যাডাম।"

"শোনো, আমাকে ম্যাডাম ডাকতে হবে না। বুলা বলে ডেকো। আর আপনি আজ্ঞেও করবে না, বুঝলে? এখন ফোনটা তো করো।"

বুলটন সঞ্জয়কে ফোন করে বলল, "তাড়াতাড়ি আয়, ইমার্জেন্সি।"

সঞ্জয় বিরক্ত হয়ে বলে, "কী করে যাব, একটা কাজে আটকে আছি তো।"

"তাহলে তোর বাবা বা ভাইকে পাঠা। বললাম না ইমার্জেন্সি!"

"দেখছি দাঁড়া। ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।"

"আধ ঘণ্টায় ম্যানেজ কর।"

"বললাম তো দেখছি, যত কথা বলবি তত দেরি হবে। বুঝলি?"

“ঠিক আছে।” বলে ফোন কাটল বুলটন। বুলার দিকে চেয়ে বলল, “আধ ঘণ্টা লাগবে আসতে।”

“বাঁচা গেল। আমি তো ভেবেছিলাম আজ আর হবেই না।”

আজ লক্ষ করল বুলটন, বুলাকে কিন্তু বেশ দেখতে। না, সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু শ্যামলা রঙের মধ্যে মুখের ডৌলখানা বেশ মিষ্টি। পরনে সাদা সালোয়ার আর হালকা মেজেন্টা রঙের কামিজ, সাদা ওড়না। চুলে চিরুনি নেই, রূপটান নেই, মুখটা তেলতেল করছে। শরীরটা মেদহীন, লকলকে। চলেই যাচ্ছিল, লবির দিকে পা বাড়িয়েও ফিরে তাকিয়ে বলল, “তোমার কখন ডিউটি থাকে বলো তো!”

“তার কিছু ঠিক আছে? কখনও সকালে, কখনও রাতে।”

“একদিন তোমার সঙ্গে গল্প করব। বাবা তোমার কথা খুব বলে। তুমি নাকি ভীষণ ভাল ছেলে, তুমি বি কম পাশ, জার্মান শিখছ, আর বাউন্সার হতে চাও।”

বুলটন লজ্জা পেয়ে বলে, “স্যার দিলদরিয়া মানুষ তো তাই ওসব বলেন। আচ্ছা আপনি তো ঘর থেকে একদম বেরোন না, তাই না?”

“না, বেরোতে ইচ্ছে করে না।”

“সারাদিন ঘরে সময় কাটে?”

“কেটে যায়। টিভি চালিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল দেখি, নইলে ইউ টিউবে গান শুনি। তবে খুব ভোরে আমি ছাদে যাই। এ বাড়ির ছাদটা তো খুব বড়। সারা ছাদ চক্কর মারি। তুমি কিন্তু এখনও আপনি আজ্ঞে করে যাচ্ছ, বয়সেও তো আমি তোমার ছোটই হব, তাই না?”

বুলটন ফের লজ্জা পেয়ে বলে, “চেষ্টা করেও হচ্ছে না যে।”

“তা বললে শুনব না, এখনই বলতে হবে। বলো, তুমি। বলো না।”

“বুলা, তুমি খুব ভাল।”

বুলা হেসে ফেলে বলল, “আমি মোটেই ভাল নই, তবু তো তুমি বলেছ, তাইতেই আমি খুশি।”

বুলা চলে গেলে ল্যান্ডিংটা বড্ড ফাঁকা লাগতে লাগল বুলটনের। মেয়েটার বয়স মাত্র উনিশ, কিন্তু এই বয়সের মেয়েদের যে ছলবলানি থাকে তা নেই। যেন একজন বয়স্কা মহিলা, টিনএজারের উচ্ছলতাটা কোথায় হারিয়ে গেল! বসে-বসে আজ বুলার কথাই ভাবতে লাগল সে।

তিন দিন বাদে দুপুরে টিফিনের কৌটো খুলে ঠান্ডা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারি খাচ্ছিল বুলটন, হঠাৎ দেখল সামনে বুলা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে সবুজ রঙের কামিজ আর সাদা সালোয়ার, সাদা ওড়না।

“কী খাচ্ছ তুমি দেখি!”

বুলটন ফের লজ্জা পেয়ে বলে, “এই তো রুটি-তরকারি।”

“মাছ খাবে? আমাদের ফ্রিজে আছে কিন্তু।”

বুলটন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, “না, না। আমার ওসব লাগে না। আমি এটা দিয়েই বেশ খেয়ে নেব।”

বুলা ফাঁকা একটা চেয়ারে বসে বলল, “বসছি। কেউ কিছু আবার বলবে না তো!”

“কে কী বলবে! তুমি বোসো তো।”

টেবিলের ওপর তার জলের বোতলটা রাখা, সেটা তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বুলা বলে, “প্লাস্টিক পুরনো হলে ইউজ় করতে নেই। বোতলটা আজই বদলে নিয়ো। এটা কিন্তু খুব ময়লা।”

"হ্যাঁ, আজই মাকে বলতে হবে।"

"খেতে-খেতে কথা বোলো না, বিষম খাবে।"

খাওয়া শেষ করে বুলটন উঠে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল। বলল, "আজ আমার ডে ডিউটি শেষ, কাল থেকে নাইট।"

"জানি। সেই জন্যই তো আজ গল্প করতে এলাম।"

"আমাদের ক্লাবে একজন এক্স-ফুটবলার আছে, জানো! তোমার সংবর্ধনার দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, দেখিস, এই মেয়েটা একদিন অলিম্পিকে যাবে।"

"পাগল! অত সস্তা নয়। আর গেলেই তো হবে না। আমরা কি সেখানে দাঁড়াতে পারব! ওদের টাইমিংয়ের ধারেকাছেও আমার টাইমিং নয়। আমাদের জন্মগত স্কিলটুকুই সম্বল। ভাল ট্র্যাক নেই, কোচ নেই, জুতো নেই, জিম নেই, সফিস্টিকেটেড ট্রেনিং নেই। বড় অ্যাথলিটদের নিজস্ব সাইকায়াট্রিস্টও থাকে তাকে মোটিভেট করার জন্য। আমরা ভেঙে পড়লে হয়তো কোচ এসে পিঠ চাপড়ে বলে, বেটার লাক নেক্সট টাইম। তার বেশি কিছু না। এখানে কোনও অ্যাথলিটের সাপোর্ট স্টাফ আছে শুনেছ? তার চেয়ে বড় কথা, ফ্যামিলিই আমাদের শেষ করে দেয়, তুমি দৌড়োবে কী করে যদি উপোসি ভাইবোনের মুখ মনে পড়ে, যদি রুগ্‌ণ বাবার কাতরানির শব্দ কানে আসে, যদি মায়ের ছেঁড়া শাড়ি চোখের সামনে ভাসে?"

"তা তো ঠিকই। তবে কী জানো, তোমার তো তবু জন্মগত একটা ট্যালেন্ট আছে, আমাদের তো তা-ও নেই। বুলা মণ্ডল তো আর ডজন ডজন জন্মায় না।"

"এদেশে না জন্মানোই ভাল, ট্যালেন্ট থেকেও যদি কিছু না হয় তার যন্ত্রণা বেশি।"

"আচ্ছা, তুমি তো একদিন ভালবেসেই দৌড়োতে, অলিম্পিকে মেডেল পাবে বলে তো নয়!"

বুলা উদাস মুখে বলল, "হ্যাঁ তো, স্কুলের স্পোর্টসে দৌড়োতাম পাঁইপাঁই করে। যেখানেই ওপেন টু অল স্পোর্টস হত, সেখানেই নাম দিতাম প্রাইজ়ের লোভে। ছুটতে খুব ভালবাসতাম, তবে প্রাইজ় বা ফেমের লোভ না থাকলে কিন্তু মোটিভেশন তৈরি হয় না। আর মোটিভেশন না থাকলে স্পিডও বাড়ানো যায় না। শুধু আনন্দের জন্য যদি দৌড়োও, তা হলে তুমি এক জায়গায় পড়ে থাকবে।"

"বেশ, এখন তো তোমার আর অ্যাম্বিশন নেই। স্পিডও বাড়ানোর কোনও দায় নেই। এখন তো আনন্দের জন্যই দৌড়োতে পারো, তাই না!"

বুলা তার দিকে বড়-বড় চোখ করে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল, "তোমার মতলবটা কী বলো তো!"

বুলার দাঁত এত ঝকঝকে সাদা আর হাসিটা এত ভাল যে, বুলটন চোখ ফেরাতে পারল না। চেয়ে রইল।

বুলা মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, "আবার আমাকে ট্র্যাকে ফেরাতে চাও নাকি! সেটা আর সম্ভব নয়। দৌড় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বুলা মণ্ডল আর দৌড়োবে না।"

কথাটা এমনভাবে বলল, বুকটা ধক করে উঠল বুলটনের। সে একটু অপেক্ষা করল। বুলা আনমনে চেয়ে আছে সামনের দিকে। ভাবছে।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে বুলটন খুব নরম গলায় বলে, "আমিও একসময়ে দৌড়োতাম, স্প্রিন্টার হব বলে নয়, ফিটনেসের জন্য।"

বুলা তার দিকে হাসিমুখটা ফেরাল। বলল, "দৌড় নিয়ে আর কথা নয়, কেমন? ওটা শুনতে আমার আর ভাল লাগে না, বুঝলে?"

বুলটন মাথা হেলিয়ে বলল, "বুঝেছি। রাগ করোনি তো?"

বুলা মাথা নেড়ে বলে, না, "রাগ করব কেন? তুমি একটা বেশ ভাল ছেলে। এখন আমার আর বেশি বন্ধু নেই। বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছি। ফেসবুক অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দিয়েছি।"

বুলটন খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বয়ফ্রেন্ড নেই?"

বুলা হেসে ফেলে বলে, "দূর, ওসবের সময় পেতাম নাকি! আর যা সব ছেলেছোকরা আশপাশে এসে জুটত, সেগুলো হেভি চালাক। আমি বাপু একটু নাকউঁচু আছি।"

"আমারও গার্লফ্রেন্ড নেই।"

বুলা ফের উদাস হয়ে গেছে, কথাটা শুনতে পেল বলে মনে হল না। মুডি মেয়ে, যখন-তখন মুড পালটে যায়। এ মেয়ের সঙ্গে সাবধানে মিশতে হবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল বুলা। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি একবার দোকান থেকে গয়না চুরি করে ধরা পড়েছিলাম, জানো? হাজতবাসও করতে হয়েছে।"

"জানি। শুনেছি।"

বুলা একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, "খুব বোকার মতো কাজ হয়েছিল। প্রতিভা না থাকলে কি চুরি করে বড়লোক হওয়া যায়, বলো! হ্যাকিং করতে, সাইবার ক্রাইম করতে কত বুদ্ধি লাগে, কত কী শিখতে হয়! এটা বোকা চোরদের যুগ নয়।"

"ঠিক কথা।"

বুলা হঠাৎ বলল, "এই শোনো, বিকেল হয়ে আসছে লোকজন আসতে শুরু করেছে। এবার আমি যাই। নইলে কে কী ভাববে!"

"আর-একটু বোসো না।"

বুলা একটু হেসে বলে, "আবার আসব তো। কতদিন কারও সঙ্গে আড্ডা মারিনি বলো তো!"

"তোমার ফোন নম্বরটা চাইলে কি তুমি রাগ করবে?"

"না, রাগ করব কেন, তবে আমি আজকাল বেশির ভাগ সময়েই ফোনটা সুইচ অফ করে রাখি। আমি ওপরে গিয়ে তোমাকে মিসড কল দিচ্ছি। আমার ফোনটা চার্জে বসানো আছে। তোমার নম্বরটা বলো।"

অবাক কাণ্ড হল, বুলা চলে যাওয়ার পর গোটা ল্যান্ডিংটায় হু-হু করে একটা স্পেস ঢুকে পড়ল যেন! এত ফাঁকা তো কোনওদিন মনে হয় না জায়গাটাকে! এই রে! সে কি প্রেমে পড়ে গেল নাকি মেয়েটার! সর্বনাশ!

এবারের নাইট ডিউটিটা ভারী একঘেয়ে শুরু হল। রোজকার মতোই। তবে আর-একটু বোরিং। এমনকী, সোমবার রাতে রাঘববাবু পর্যন্ত রাত এগারোটায় ফিরে এলেন। ট্যাক্সি থেকে নামাতে এগিয়ে গিয়েছিল বুলটন, কিন্তু স্যার নিজেই দিব্যি নেমে এলেন, ডান হাতটা উঁচু করে বললেন, "ধরতে হবে না, আজ ঠিক আছি।"

লবির দিকে না গিয়ে হঠাৎ আজ ল্যান্ডিংয়ে বুলটনের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, "তোমার তো খুব বাউন্সারের চাকরি পছন্দ, তাই না?"

বুলটন রাঘববাবুর সম্মানে চেয়ারে বসেনি, দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "হ্যাঁ স্যার।"

"একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে, মধু খাবড়া। তার একটা বার আছে তপসিয়ায়। তাকে বলেছি। তোমাকে পছন্দ হলে নিয়ে নেবে। কাল গিয়ে একবার দেখা কোরো। এই নাও ওর বিজ়নেস কার্ড।"

কার্ডটা হাতে নিয়ে বুলটন রাঘববাবুকে একটা প্রণাম করে ফেলল। তার বহুকালের একটা স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে! অবিশ্বাস্য।

রাঘববাবু হেসে বললেন, "আগে চাকরিটা তো হোক, তারপরে তো প্রণাম!"

দুপুর বারোটায় সুইনহো স্ট্রিটের অফিসে যেতে বললেন মধু খাবড়া। গলাটা বেশ রাশভারী, অথরিটেটিভ।

ঠিক দুপুর বারোটাতেই ভিতরে যাওয়ার ডাক এল। ছোট, সাজানো চেম্বারটায় ঢুকে যে লোকটার মুখোমুখি হল বুলটন, তার চেহারাও জবরদস্ত। লম্বা-চওড়া, মজবুত শরীর, তবে একটু চর্বি আছে পেটে। পঞ্চাশের আশপাশে বয়স। তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "তুমি তো সিকিওরিটি গার্ড! বাউন্সারের কাজ কিন্তু অন্যরকম। পারবে?"

"হ্যাঁ স্যার, পারব।"

"তোমাকে রাঘববাবু রেকমেন্ড করেছেন, কাজেই ইউ মাস্ট বি ওকে। ঠিক আছে। আজ একুশ তারিখ, তুমি এক তারিখে জয়েন করো। কিছুদিন তোমার কাজ দেখা যাক, তারপর স্যালারি নিয়ে কথা হবে। তবে ইট উইল বি অ্যারাউন্ড টেন থাউজ্যান্ড।"

বেতন কোনও ব্যাপার নয় তার কাছে, যা হোক একটা হলেই হবে। বাউন্সার হওয়াটাই আসল কথা।

সোমবার ডে ডিউটি করতে এসে মনটা একটু খারাপ লাগছিল বুলটনের। জীবনের চেনা ছকটা পালটে যাবে তার। সম্পূর্ণ অজানা একটা জগতে ঢুকে যাবে সে। বার ড্যান্সার, নিবু নিবু আলো, অ্যালকোহলের মাদক গন্ধ, চড়া মিউজ়িক, উচ্চকিত ড্রামের রিদ্‌ম, মাতালদের অসংলগ্ন প্রলাপ, চোরা চাউনি, সন্দেহজনক মানুষ, মস্তান এবং তরল মহিলারা। হ্যাঁ, থ্রিল আছে, অ্যাডভেঞ্চারের আভাস আছে, রিস্কও কি নেই? ঠিক বুঝতে পারছে না বুলটন। একটু অস্বস্তিও হচ্ছে তার।

খুব আনমনে এসব ভাবছিল বুলটন। গত এক সপ্তাহ রাঘববাবু নামমাত্র নেশা করে ফিরছেন। নিজেই উঠে যাচ্ছেন ফ্ল্যাটে, তার সাহায্যের দরকার হচ্ছে না। বুলার সঙ্গে তাই দেখাও হয়নি তার। মুডি মেয়ে, এ সপ্তাহেও দেখা হবে কি না কে জানে! সামনের সপ্তাহে নতুন কাজে চলে যাবে সে। আর হয়তো দেখাই হবে না। সেটা অবশ্য ভালই হবে হয়তো। সে বোধ হয় একটু দুর্বল হয়ে পড়ছিল মেয়েটার প্রতি। সে কোনও সম্পর্কে জড়াতেই চায় না। অফার থাকা সত্ত্বেও সে কখনও জড়ায়নি।

বাজারে যখন যেটা সস্তা সেটাই তার টিফিন বক্সে চলে আসে। আজ দুপুরে টিফিনের বাক্স খুলে দেখল, রুটির সঙ্গে কুদরির তরকারি। খিদের মুখে কিছুই খারাপ লাগে না তার। একটু কটকটে ঝাল হলেই হল।

"কী খাচ্ছ শুনি!"

বুলটনের বুকটা একটা বলটান খেল। আজ পরনে একটা বুটিকের কাজ করা সাদা জমিনের শাড়ি। একই কাজ করা ব্লাউজ়, মাথায় মস্ত খোঁপা। মুখটা তেমনই রূপটানহীন, তেলতেলে। হাসিটা সম্মোহন জানে। চোখ ফেরানো যায় না। অপ্রস্তুত বুলটন তটস্থ হয়ে বলে, "এই তো দ্যাখো না, মা আজ কুদরির তরকারি দিয়েছে।"

পাশের চেয়ারটায় আস্তে করে বসে বলল, "ঠিক তোমার টিফিনের সময়েই এসেছি ভাগ্যিস। কুদরি আমার বেশ লাগে।" বলেই মুখ টিপে একটু হেসে হঠাৎ আঁচলের আড়াল থেকে একটা স্টিলের ঝকঝকে বাটি বের

করে এনে বলল, "তোমার জন্য এনেছি।"

বুলটন ভয় খেয়ে বলে, "কী এনেছ?"

কৌটোর ঢাকনাটা খুলল বুলা, মাংসের মোগলাই গন্ধটা যেন জড়িয়ে ধরল বুলটনকে। সে চোখ কপালে তুলে বলে, "তুমি আমার চাকরিটাই খাবে। সেক্রেটারি টের পেলে তাড়িয়ে দেবে আমাকে।"

"আর ন্যাকামি করতে হবে না। চাকরি তো নিজেই ছেড়ে দিচ্ছ শুনলাম। কাল রাতে আমি নিজে রেঁধেছি। খেতে হবে। তোমার ফেয়ারওয়েল ট্রিট।"

বুলটন হাসল না, বুলার দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, "মনটা বেশ খারাপ লাগছে, জানো!"

"কেন, এটাই তো তোমার অ্যাম্বিশন ছিল বলে জানতাম।"

"হুঁ। তবু কেমন একটা লাগছে। এ তো অনেকটা এনেছ!"

"খাও।"

মুরগিটা এত ভাল রান্না হয়েছে যে, বুলটন অবাক হয়ে বলে, "এ তো শেফদের মতো রান্না! দারুণ!"

বুলা উদাস হয়ে বলে, "গরিবদের রান্না ভালই হয়। না হলে চলবে কেন?"

"বোধ হয় ঠিকই বলেছ। আমার মা তো কচু ঘেঁচু এমন রাঁধে যে, চেটেপুটে খেতে হয়।"

"মায়ের রান্না সব ছেলেরই ভাল লাগে, ওটা মা বলেই।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"মাংস জুটে গেছে বলে আবার কুদরিটাকে ফেলে দিয়ো না। ওটাও খেয়ো।"

"মাংস আজ কুদরির উইকেট ফেলে দিয়েছে, বুঝলে। তবে খেয়ে নেব।"

বুলটন খেয়ে নিল। হাতমুখ ধুয়ে এসে বলল, "দাঁড়াও, তোমার বাটিটা ধুয়ে দিই।"

বুলা ভারী বিরক্ত হয়ে বলে, "রাখো তো, তোমাকে গিন্নিপনা করতে হবে না, ওপরে বাসন মাজার লোক আছে।"

বুলটন আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বসে পড়ল। বুলা ফের উদাস মুখ করে অন্য দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন পাশে বুলটন নেই, কেউ নেই। বুলটনও সাবধান হল, মুডি মেয়ে, অল্পেই বিগড়ে যায়। তাই কথা না বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেক অনেকক্ষণ বাদে বুলা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চারদিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ যেন বুলটনকে দেখে চিনতে পারছিল না এমনভাবে চেয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, "চাকরিটা তা হলে নিচ্ছ!"

বুলটন কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "কী আর করব বলো তো!"

"কিছু যদি মনে না করো, তা হলে একটা কথা বলবে?"

"কেন বলব না? পুছো তো সহি।"

বুলা হেসে ফেলল। তারপর বলল, "এখানে তুমি কত পাও?"

"সাড়ে সাত হাজার, নাইট অ্যালাউন্স ধরলে হাজার দশেকের মতো। আর চারটে গাড়ি ধুয়ে আরও চার হাজার।"

"আর ওরা কত দেবে?"

"বলছে তো অ্যারাউন্ড টেন থাউজ্যান্ড।"

বুলা যেন কী একটু ভাবল। তারপর বলল, "তুমি বাউন্সার হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখো, তাই তোমাকে বলে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এই চাকরি কি তোমাকে মানায়? মাতাল বদমায়েশদের সামলানো, গুন্ডা মস্তানদের পাঙ্গা নেওয়া, এটা কি কোনও ভাল কাজ? বাবা বলেন, বাউন্সারদের মধ্যে অনেকে আছে যারা নাকি মাতালদের পকেট থেকে টাকা তুলে নেয়। তোমার ধারণা হয়তো বাউন্সারের চাকরিটা খুব থ্রিলিং, অ্যাডভেঞ্চারাস, কিন্তু আসলে কি তাই? তারা শুঁড়ির মাইনে করা গুন্ডা কাম দরোয়ান। আর বেশিদিন ওই পরিবেশে থাকলে ওই অন্ধকার একটু একটু করে তোমার ভিতরেও ঢুকে যাবে। আমি মাতালদের ভীষণ ভয় পাই, রিপালসিভ বলে মনে হয়। অতক্ষণ মাতালদের পরিবেশে থাকতে গেলে আমি তো পাগল হয়ে যেতাম। বাবা বলছিল, বুলটনটার খুব ইচ্ছে দেখে আমি একটা ব্যবস্থা করেছি বটে, কিন্তু ভাল ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

বুলটন চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পরে খুব মৃদুস্বরে বলল, "এই চাকরিটাও তো খুব সম্মানজনক নয় বুলা! এখানে পড়ে থেকেই বা কী হবে বলো! এর তো কোনও ভবিষ্যৎও নেই!"

"হুঁ, তা ঠিক। আমিও একসময়ে রেলের চাকরির জন্য পাগল হয়েছিলাম, রেল আমাকে কথা দিয়েও নেয়নি। খুব ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু আবার তো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এই যে শাড়িটা পরে আছি দেখছ? কেমন বলো তো!"

"শাড়ি-টাড়ি তো আমি ভাল বুঝি না, তবে তোমাকে খুব মানিয়েছে। শাড়িটা তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে।"

বুলা হেসে ফেলে বলল, "থাক বাবা, তোমাকে আর মতামত দিতে হবে না। তবে এ শাড়িটা আমার নিজের ডিজ়াইন করা, নিজেরই কাজ করা। বাজারে এটা সাত হাজারে বিক্রি হবে। আমাকে মা আজ সকালে জোর করে পরিয়েছে। নইলে আমি শাড়ি পরি নাকি! মা বলল, শাড়ি না পরলে ফিলিংসটা আসবে না, মাঝে-মাঝে পরতে হয়। তাই পরে আছি। এটা হল কনজ়িউমারস মার্কেট, লোকের হাতে পয়সা আছে, তারা কিনতেও চায়। ঠিকমতো জিনিস বানাও, মার্কেটিং করো, সব বিক্রি হবে। যদি ঠিকমতো চানাচুরও বানাতে পারো, তা হলেও শিল্পপতি হয়ে যাবে। তুমি সারা জীবন মাতাল সামলে সেই স্যাটিসফ্যাকশন পাবে কি?"

বুলটন অবাক হয়ে বলে, "ওরে বাবা, সেসব তো অনেক বড় কথা!"

"বড় কথা মনে করে ভয় পেলে কিছু করা যায় না। তুমি যে বাউন্সারের চাকরি করবে সেটা মা-বাবাকে জানিয়েছ?"

"হুঁ। তবে তারা ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। তারা শুধু জানে ছেলে একটা ভাল কাজ পেয়েছে।"

"বুঝলে মত দিত না।"

"তা ঠিক। আচ্ছা স্যার আজকাল তেমন ড্রিংক করেন না তো!"

"তোমাকে তো বললাম, আমি মাতাল দু'চোখে দেখতে পারি না। বাবাকে সোজা বলে দিয়েছি, তুমি যদি মাতাল হও তা হলে আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তাই ভয় পেয়েছে। আমার হাতে-পায়ে ধরে বলেছে, একবারে ছাড়লে অসুখ করবে, আস্তে-আস্তে ছাড়ব। তাই কম খাচ্ছে। তবে একদম ছেড়ে দেবে, আমি জানি।"

"তোমাকে খুব ভালবাসেন তো!"

"ওদের তো ছেলেপুলে নেই। যখন ছোট ছিলাম তখনই আমার মা একবার কাজ করার জন্য আমাকে ওদের কাছে এনেছিল। তখন বাবা আর মা থাকত যাদবপুরে। মা আমাকে দেখেই আমার মাকে বলে, ও মা, এ কাজ করবে কেন, আমাকে দাও, আমি ওকে পুষ্যি নেব। মা রাজি হয়নি। আমরা ঢাকা জেলার মানুষ, তখন যাদবপুরে বিধানপল্লির রেফিউজি কলোনিতে থাকতাম। সেই থেকে শুরু সম্পর্ক। এখন আর ছাড়তে চায় না। জেল থেকে বাবাই ছাড়িয়ে এনেছে। আমিই-বা আর কোথায় যাব বলো? এখানে আছি বলে রোজগার হচ্ছে, মা-বাবাকে টাকা পাঠাতে পারছি।"

"বাঃ, বেশ মজা তো! এখন তোমার দুটো বাবা আর দুটো মা।"

বুলা হেসে বলে, "শুধু মজা নয়, ঝামেলাও আছে, দু'জোড়া বাবা-মায়েরই বেজায় ঝগড়া। সামাল দেওয়াই মুশকিল। তবে হ্যাঁ, এরা আমাকে ভালওবাসে খুব। মা নিজের হাতে আমাকে বুটিকের কাজ শেখায়।"

"এই ব্যবসায়ে কি অনেক লাভ?"

"খারাপ কী বলো! খাটতে হয় বটে, কিন্তু মাসে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা হয়েই যায়। মার্কেটিংটা ঠিকঠাক হলে আরও বাড়বে। একটাই মুশকিল, লার্জ স্কেলে বুটিক করার জন্য অনেক এক্সপার্ট হ্যান্ডস দরকার। তুমি তা হলে এক তারিখে নতুন কাজে জয়েন করছ!"

"সে রকমই কথা হয়ে আছে।"

"আর হয়তো দেখা হবে না। ভাল থেকো।"

চেয়ারটায় আস্তে করে বসেছিল বুলা, তেমনই আস্তে উঠে দাঁড়াল।

"এখনই চলে যাবে? আর-একটু বোসো না।"

"কাজ করতে করতে উঠে এসেছিলাম, ঘরময় জিনিস ছড়িয়ে আছে। হাতে অর্ডার রয়েছে, সময়মতো দিতে হবে তো।"

বুলা চলে যাওয়ার পরই এক শূন্যতার অনুপ্রবেশ। হু হু করে একটা স্পেস যেন কোথা থেকে উড়ে এসে ডানার বিষণ্ণ ছায়ায় চারদিকের সব ঔজ্জ্বল্য ঢেকে দিল। কী যে হচ্ছে এসব!

পরপর তিনদিন আর বুলার দেখা নেই। ফোন করতে ঠিক সাহসে কুলোয় না, ইচ্ছে করে কিন্তু।

ডে ডিউটির একেবারে শেষের দিন সকাল থেকেই খুব ঝড় আর বৃষ্টি। আলো নেই। ল্যান্ডিং ফাঁকা। খুব একা বসে ছিল বুলটন। আর দুটো দিন, তারপর সে একটা অচেনা জগতে ঢুকে পড়বে। কেমন হবে কে জানে। তবে সে বরাবর দেখে এসেছে, যা কল্পনা করা যায় বা যা ধরে নেওয়া হয় বাস্তবের সঙ্গে তা মেলে না। চাকরিটা যতটা থ্রিলিং হবে বলে সে ভেবেছিল ততটা বোধ হয় হবে না। তাই একটু ভয়-ভয় করছে তার। তার জিগরি দোস্ত হল রাজু, সে শুনে বলেছে, তুই খরচা হয়ে যাবি। রাজু বেশি কথা কয় না, একটু কীরকম আছে যেন। নরমাল অ্যাবনরমাল।

টিফিনের কৌটোটা খুলে আজ বুলটন অবাক। রুটির সঙ্গে আলুপোস্ত! মা পোস্ত পেল কোথায়! পোস্ত খাওয়ার ধক তো তাদের নেই! দু'-একবার রুটির সঙ্গে মাখিয়ে খেয়ে দেখল পোস্ত নয়, সাদা সরষে। দেখতে হুবহু পোস্ত। বিভ্রম! তা বিভ্রম জিনিসটাও খারাপ নয়, বিভ্রমে বিভ্রমেই জীবনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যায়। খেয়ে একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল তার। প্লাস্টিকের টেবিলটায় মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নিল। বৃষ্টি ছাড়া কোনও ঘটনা নেই আজ। কোনও সংবাদ নেই। ক্রমে বিকেল হয়ে গেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। রবিঠাকুরের একটা

লাইন মনে পড়ছিল তার। মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে চলে গেল দিন। মনে-মনে চুপিচুপি একটা আশা ছিল আজ শেষ দিনটায় বুলা একবার আসবে। এল না। রাত-ডিউটির সুকুমার এলে নিজের ছাতাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল সে। একা এবং বড্ড সঙ্গীহীন।

ফোনটা করল সকালে এবং হঠাৎ, কিছু ভেবেচিন্তেও নয়।

মধু খাবড়ার গমগমে গলাটা যেন ধমকে উঠল তার কানে, “হ্যাল্লো!”

“স্যার, আমি ভোলানাথ সর্দার।”

“কে ভোলানাথ?”

“আমি স্যার, বুলটন। রাঘববাবুর রেফারেন্সে বাউন্সারের চাকরির জন্য গিয়েছিলাম।”

“ও হ্যাঁ, বলো।”

“স্যার, আমি চাকরিটা করব না। সরি।”

“ইটস ইয়োর চয়েস জেন্টলম্যান। ওকে। ইউ আর ওয়েলকাম।”

বলেই ফোনটা কেটে দিল খাবড়া। বুলটন হাঁফ ছাড়ল। কাল থেকে নাইট ডিউটি।

৫

"ইলিনা ওর দাদুকে খুব ভালবাসত। দাদুই ছিল ওর সব, ওর মা-বাবা। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম, ওর বাবার ছিল ট্যুর আর মিটিং। আমরা মেয়েকে সময় দিতে পারিনি। সারা দিন ইলিনা, সেই তিন বছর বয়স থেকেই দাদুর কাছে মানুষ। দাদুই খাইয়ে দিত, স্নান করাত, ঘুম পাড়াত, পটি পর্যন্ত করাত। একজন বেবিসিটারও ছিল, কিন্তু তাকে বেশি কিছু করতে হত না, ফাইফরমায়েশ খাটা ছাড়া। দাদু আর নাতনির বন্ডিং ছিল সাংঘাতিক। যখন স্কুলে যেত তখনও দাদুই চলনদার। আর দাদুও এমনই যে, নাতনির স্কুলের সময়টা ঠায় বসে থাকত স্কুলের বাইরে, গাছতলায় বা পার্কের বেঞ্চে। ছুটি হলে নিয়ে আসত। যখন স্কুলবাসে যাওয়া শুরু করল তখনও দাদুই বাসে তুলে দিত, নামিয়ে আনত। এত চোখে চোখে রাখত যে, ইলিনার দুর্ঘটনা খুব একটা ঘটেনি, পড়ে যাওয়া বা কেটেকুটে যাওয়া। অসুখবিসুখ হলে দাদু সারাক্ষণ ইলিনার পাশে, অতন্দ্র। আমাদের কখনও ইলিনার জন্য ভাবতেই হয়নি। তবে দাদুর অত ন্যাওটা হওয়ার ফলে আমাদের, অর্থাৎ মা-বাবার সঙ্গে ওর বন্ডিংটা ছিল একটু দুর্বল। দেখা হলে গ্রিট করত বটে, তবে যেন প্রতিবেশীর মতো। হাই মা, হাই বাবা বলে একটু ভদ্রতার হাসি হেসে নিজের পড়া বা খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। রাতে আমাদের কাছে শুতে চাইত না, জোর করে শোওয়ালেও মাঝরাতে উঠে কান্নাকাটি জুড়ে ঠিক দাদুর কাছে চলে যেত। ওর যখন সাত বছর বয়স তখন আচমকা সেরিব্রালে দাদু মারা যায়। মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। মৃত্যু জিনিসটা কী সেটা আমরা কিছুতেই ইলিনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি। দাদুর ডেডবডি কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তারপর দাদু কোথায় গেল, কেন আসছে না, দাদুকে ফোন করো, এইসব বলে বলে আমাদের হয়রান করে মারত। তারপর হঠাৎ একদিন বেশ শান্ত হয়ে গেল এবং স্বাভাবিকও। আমরা ধরে নিলাম হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে এবং হয়তো দাদুকে একটু একটু করে ভুলে যাচ্ছে। ছুটির দিনে, সামার বা পুজো ভেকেশনে ইলিনাকে বেবিসিটারের কাছে রেখে আমরা বেরিয়ে যেতাম। একদিন আমি হঠাৎ আর্লি ফিরে এসে ডোরবেল বাজিয়ে কোনও সাড়া পাই না। অনেকক্ষণ বাদে ইলিনা দরজা খুলে দিতে ঘরে ঢুকে দেখি বেবিসিটার নেই, আর ইলিনার বিছানায় একটা দাবার বোর্ড পাতা, তাতে ঘুঁটিও সাজানো। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুই দাবার বোর্ড পেলি কোথায় আর কার সঙ্গেই-বা খেলছিলি আর কুসুমই-বা কোথায় গেল। ইলিনা খুব বিরক্ত। বলল, কুসুমদি তো রোজই এ সময়ে কোথায় যেন চলে যায় আর আমি তো দাদুর কাছে বসে দাবা শিখছিলাম। তুমি এলে বলে দাদু চলে গেল। কে এটা বিশ্বাস করবে বলুন! আমি খুব বকলাম, তুমি আজকাল মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ, দাদু মারা গেছেন, তিনি কী করে তোমাকে দাবা শেখাতে আসবেন। আর দাবার বোর্ড তো উড়ে আসেনি, কোথায় পেলি দাবার বোর্ড? ইলিনা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, দাবার বোর্ড তো ওই স্টিলের আলমারির ওপরে ছিল, আমি চেস শিখব বলে দাদুই বলল, আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে আনতে। আমি চেয়ারে উঠে নামিয়ে আনলাম।

“পরে নীলাঞ্জন সব শুনে বলল, একটা দাবার বোর্ড নাকি সত্যিই আলমারির মাথায় রাখা ছিল। পরে কুসুমকে খুব বকলাম মেয়েকে একা রেখে চলে যাওয়ার জন্য। কুসুম বলল, আমি কী করব, ইলিনাই তো আমাকে বলে, তুমি কোথাও ঘুরে এসো, তুমি থাকলে দাদু আসবে না।

“ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়নি। ইলিনাকে স্কুলের পর বাস থেকে নামিয়ে আনতে যেত কুসুম। একদিন যেতে গিয়ে স্কুটারের ধাক্কায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আনতে যেতে পারেনি। আমি অনেক পরে খবর পেয়ে পাগলের মতো বাড়ি ছুটে এসে দেখি ইলিনা বাড়িতে এসে গেছে। বলল, চিন্তা করছিলে কেন মা, আমাকে তো দাদুই বাস থেকে নামিয়ে হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে নিয়ে এল। তারপর এতক্ষণ দাদুর সঙ্গেই তো কথা বলছিলাম। কত গল্প হল। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, দাদুর শোকে বাচ্চাটা পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! হোমটাস্ক করাতে গেলে রোজই বলত, হোমটাস্ক? সে তো কখন হয়ে গেছে, স্কুল থেকে ফেরার পরই তো দাদুর সঙ্গে একটু গল্প হল, তারপর দাদুই হোমটাস্ক করিয়ে দিল। বিশ্বাস করিনি, কিন্তু খাতা খুলে দেখলাম সত্যিই হোমটাস্ক করেছে এবং ভুল-টুলও নেই। কী হচ্ছে এসব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভয়-ভয় করত। একদিন বলল, আজ টিফিনে একটা ইঁদুরে খাওয়া কলা দিয়েছিলে কেন মা? কলাটা খেতে যাচ্ছিলাম তখন দাদু বলল, ওটা ইঁদুরে কেটেছে, খাস না, খেলে অসুখ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাদু কি স্কুলেও তোর কাছে যায়! বলল, সব সময়ে যায় না, মুশকিল-টুশকিল হলে যায়। আমরা অনেক বারণ করা সত্ত্বেও ও কিন্তু ওর দাদুর ঘরেই থাকত। অন্য ঘরে যেতে চাইত না। প্রায়ই শুনতে পেতাম খুব ভোরবেলা কাকে যেন বলছে, ওঃ আর-একটু ঘুমোতে দাও না দাদু, প্লিজ! আচ্ছা, আর দশ মিনিট! শেষপর্যন্ত আমরা সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যাইনি। আমি নিজেও খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ নই। আমার মা-বাবা বলত আমি নাকি খুব ভাবের ঘোরে চলি, চেনা রাস্তা ভুলে অচেনা রাস্তায় চলে যাই, সব সময়ে কী যে আবোল তাবোল ভাবি, যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। বহুবার হয়েছে ঘরে চাবি রেখে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেছি। পার্স ফেলে বেরিয়ে গেছি হয়তো কেনাকাটা করতে। আমাকে এর জন্য বহুবার অপ্রস্তুত হতে হয়েছে এবং এখনও হয়। নীলাঞ্জন আমাকে বুঝিয়েছিল, মেয়ে আমার মতোই ইমাজিনেশনের জগতে বাস করে, তাই এক ভারচুয়াল দাদুকে বানিয়ে নিয়েছে। আমার অবশ্য তা মনে হয়নি, কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। একদিন আমার এক বান্ধবী তার বর আর ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। ছেলেটার বয়স সতেরো-আঠারো, খুব স্মার্ট, ভাল ছাত্রও। দাবা বোর্ডটা দেখে বলল, দাবা কে খেলে? আমি বললাম আমার শ্বশুরমশাই ভাল দাবাড়ু ছিলেন বলে শুনেছি, এখন কেউ খেলে না। আমার মেয়ে ফোঁস করে উঠল, কেন, আমি তো খেলি। মেয়ের বয়স তখন আট সাড়ে আট। বান্ধবীর ছেলে শুনলাম আলেখিন চেস ক্লাবে দাবা খেলে এবং ভালই খেলে। দু'জনে দাবা খেলতে বসে গেল দিব্যি। আমরা গল্প করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলেটা অবাক গলায় বলল, আরে, তুমি তো প্রফেশনালদের মতো খেলো! শেষে হেরে গিয়ে ছেলেটা বলল, আন্টি, ইলিনাকে আমাদের ক্লাবে ভর্তি করে দিন। ও কিন্তু খুব ট্যালেন্টেড। আমি দাবার ঘুঁটিই চিনি না আর নীলাঞ্জন দাবা খেলার সময়ই পায় না, তা হলে ইলিনাকে দাবা শেখাচ্ছে কে! ইলিনা অবশ্য জিজ্ঞেস করলেই বলে, দাদুই তো শেখায়। কিন্তু সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার অবিশ্বাসই-বা করি কী করে বলুন! আমাদের এক প্রতিবেশী মিসেস গাঙ্গুলি আমাকে বলতেন, হ্যাঁ গো তামসী, তোমার মেয়েটাকে প্রায়ই দেখি রাস্তা দিয়ে একা-একা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরে, তুই কার সঙ্গে কথা কইছিস? একগাল হেসে বলল, দাদুর সঙ্গে। কী ব্যাপার বলো তো! কী বলি বলুন তো,

আমিই কি জানি! কিন্তু ফেজটা একদিন হঠাৎ করে কেটে গেল। যেদিন ওর মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং শুরু হল সেদিন থেকেই দাদু আর আসত না। আর তখন থেকেই মেয়ে পাগল-পাগল। আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করত, দাদু আসছে না কেন বলো তো মা! দাদুর কী হল? আমি বুঝিয়ে বললাম, যতদিন তুমি ছোট ছিলে ততদিন দাদু তোমাকে গার্ড দিতেন, এখন তো তুমি অ্যাডাল্ট হয়েছ, তাই দাদু এবার একটু রেস্ট নিচ্ছেন। কিন্তু মেয়ে বুঝতে চাইত না। খুব কান্নাকাটি করত। তারপর কান্না থামল বটে, কিন্তু কেমন যেন মেলাংকলিক হয়ে গেল। হাসে না, কথা কম বলে, গুম হয়ে থাকে। আর শুরু হল আমাদেরও অধোগতি। নীলাঞ্জনের ব্যাবসা মার খাচ্ছিল, একজন পার্টনার ক্যাপিটাল তুলে গুটিয়ে নেয় আর আমার চাকরিও যায়। আমি টেনশন নিতে জানি না, অল্প বিপদেই ভীষণ আপসেট হয়ে পড়ি, আমার মনের কোনও জোরই নেই। আর একসঙ্গে এতগুলো খারাপ ঘটনা সহ্য করার ক্ষমতাই আমার নেই। আমার মেয়ের সামনেই ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, নীলাঞ্জনের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। নীলাঞ্জন প্রচণ্ড ড্রিংক করত, ভীষণ উওম্যানাইজ়ারও ছিল। বেশ কয়েকবার খবর পেয়েছি, অফিসের কোনও মহিলা এমপ্লয়ির সঙ্গে সিঙ্গাপুর বা হংকং-এ গেছে, আর কারও সঙ্গে হয়তো ব্যাংকক বা দুবাই। কিছু বলতে গেলে প্রচণ্ড ঝগড়া করত, গায়ে হাতও তুলত যখন-তখন। আমার উপায় থাকলে আমি হয়তো ডিভোর্সের চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার বাবা ছাড়া আর কেউ ছিল না, আমার বিয়ের দু'বছর পরেই বাবা মারা যান। তাঁর প্রপার্টি তেমন কিছু ছিল না। একটা ফ্ল্যাট ছিল আর প্রভিডেন্ড ফান্ডের অল্প কিছু টাকা। ফ্ল্যাট বিক্রি করে সব টাকা নীলাঞ্জনের ব্যাবসায় লাগানো হয়েছিল, সঙ্গে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও। বদলে আমাকে কোম্পানির পার্টনার করা হয়েছিল বলে শুনেছি। কিন্তু ওই ব্যাবসার কিছুই আমি বুঝতাম না। নীলাঞ্জন বোঝানোর চেষ্টাও করেনি। আমাকে যদি আপনার বোকা বলে মনে হয়ে থাকে, তা হলে আমি বলেই দিচ্ছি যে, আমি সত্যিই বোকা, খুব বোকা, যতটা আপনি ভাবছেন তার চেয়েও বেশি বোকা। নীলাঞ্জনের ওপর হান্ড্রেড পারসেন্ট নির্ভর করা ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। নীলাঞ্জন অবশ্য আমাদের জন্য প্রচুর খরচ করত একসময়ে। তখন সুখেই থেকেছি। ব্যাবসা যখন ডোবার মুখে, তখন হারাধন নায়েক অনেকটা ত্রাণকর্তার মতো এসেছিলেন। আগে থেকে চেনা ছিল। নীলাঞ্জনের বেশ ভাল বন্ধুই ছিলেন তিনি। বিপদের দিনেও তিনি এসে পাশে দাঁড়ালেন, বেশ অনেক টাকা ঢাললেন বলেও খবর পেলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল নীলাঞ্জন খুব খুশি নয়। বাড়িতে ফিরে মনখারাপ করে বসে থাকত আর বেসামাল ড্রিংক করে যেত। কানাঘুষো শুনেছি, কোম্পানি হাতবদল হয়ে গেছে। নীলাঞ্জন হয়ে গেছে কোম্পানির এক কর্মচারী মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

"নীলাঞ্জনের মৃত্যুটা নিয়ে একটু কানাঘুষো আছে। অনেকে বলে ওকে খুন করা হয়েছে। আমি জানি না ঠিক কী ঘটেছিল। তবে এটা জানি যে, ও ইদানীং এতটাই ড্রিংক করত যে, এরকম মৃত্যু হতেই পারে। আবার খুনও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মোটিভ তো একটা থাকবে! ওর তো আর কিছুই ছিল না, না টাকা, না ক্ষমতা। ওকে মেরে কার কী লাভ! এক হতে পারে কারণটা আমি। মিস্টার নায়েক আমাকে দখল করার জন্য ওকে সরিয়ে দিয়েছেন, এমন সন্দেহ কারও-কারও আছে বলে শুনেছি। হতেও পারে, না-ও হতে পারে। পুলিশ কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে করেছিল। আমি মিস্টার নায়েকের প্রতি কোনও দুর্বলতা কখনও ফিল করিনি। তবে আমার দুঃসময়ে তিনি পাশে না দাঁড়ালে আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম। শুধু আমি নয় আমার মেয়েটাও। ও আমার মতোই দুর্বল মনের মেয়ে, সহজেই ভেঙে পড়ে। তখন আমাদের টাকা নেই, শ্বশুরের

তৈরি বাড়িটাও বাঁধা রেখেছিল নীলাঞ্জন, সুতরাং আমাদের আশ্রয়ও নেই। কোথায় যাব মেয়েটাকে নিয়ে, কী হবে আমাদের, এই চিন্তায় দিশাহারা, নীলাঞ্জনের জন্য শোকও একটু হয়েছিল, কিন্তু ও যেভাবে আমাদের দু'জনকে পথে বসিয়ে গেছে, তাতে শোকও তেমন উথলে ওঠেনি। মেয়েটা অবশ্য বাবার জন্য খুব কেঁদেছিল। মিস্টার নায়েক কিছুদিন ধরেই আমার কাছ এসে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলছিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম উনি ঘনিষ্ঠ হতে চাইছেন। কিন্তু তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থা আমার নয়। একা হলে আমি হয়তো আত্মহত্যাই করতাম তখন, কিন্তু মেয়েটা তো রয়েছে, টিনএজার মেয়ে, তাকে তো ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারি না। মিস্টার নায়েকের ধৈর্য কম, কিছুদিন পরে একদিন এসে তিনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উনি ওঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স করার মামলাও দায়ের করেছেন, এটা আমি জানতাম। আমি দেখলাম ভালবাসা-টাসা নিয়ে মাথা ঘামানোর আর মানে হয় না। রোমান্টিক হওয়ার বয়স বা পরিস্থিতিও আমার নয়। শুধু বেঁচে থাকা আর মেয়েটাকে রক্ষা করার জৈব তাগিদে আমি রাজি হতে দ্বিধা করিনি। স্বীকার করতে হবে মিস্টার নায়েক আমাকে ঠকাননি। এই ফ্ল্যাটটা উনি মিস্টার জানার কাছ থেকে কেনার জন্য ডিল করেছিলেন এবং সেটা আমার নামেই। তবে ঝানু লোকের সঙ্গে আমি তো বুদ্ধির লড়াইয়ে পারব না। কিন্তু মিস্টার নায়েকের সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের প্রস্তাবে আমার মেয়ে ভীষণ খেপে গিয়েছিল। অন্নজল বন্ধ করে ঘরে দোর দিয়ে, কেঁদে ভাসিয়ে দিত। পাগলের মতো চিৎকার করে বলত, তুমি কীভাবে এটা করতে পারো? আমি তোমাকে মা বলে মানতেই পারছি না আর। সে যে কী অশান্তি তা বোঝাতে পারব না। আমিও ভেঙে পড়েছিলাম খুব। আমাদের জীবনটা যে আর আগের মতো নেই, আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো যে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আর নেই, সেটা বুঝতে ওর সময় লাগল। এখন অন্যের ইচ্ছেতেই চলা ছাড়া আমাদের যে উপায় নেই সেটা জানান দিতে লাগল আমাদের খিদে, আমাদের নানা ছোট-বড় প্রয়োজন, আমাদের রকমারি অভাব, আর চারদিকের খাঁ খাঁ করা নেই-নেই শূন্যতা। বাড়ি থেকে উচ্ছেদের নোটিস তো এলই, একদিন কয়েকটা গুন্ডা ছেলে এসে বলে গেল, মানে-মানে উঠে না গেলে তারা কী কী করতে পারে। তাতে রেপ করার হুমকিও ছিল। আরও অনেক খারাপ কথা, যা আমি জন্মেও শুনিনি। এরকম কথাও যে আছে বা হয় তাও জানা ছিল না। আমরা মা-মেয়ে ভয়ে যেন পুঁটুলি পাকিয়ে গেলাম। আমার মেয়ে একদম হতবাক হয়ে রইল কয়েকদিন। যেন বোবাকালা জড়বুদ্ধি। তারপরও যে মত দিল তা নয়। শুধু একদিন বলল, তুমি যা খুশি করতে পারো, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। এক বন্ধুর বাড়িতে দু'দিন কাটিয়েও এল। অবশেষে মিস্টার নায়েকের সঙ্গে আমরা একদিন এই সুন্দর ফ্ল্যাটটায় চলেও এলাম। বলতে নেই, মিস্টার নায়েক আমাদের অ্যাফ্লুয়েন্সের মধ্যেই রেখেছেন। জিনিসপত্রের অভাব রাখেননি, ইচ্ছেমতো খরচ করার ব্যবস্থা করেছেন, মেয়ের স্কুলে যাওয়ার জন্য গাড়ি, আমার নামে ডেবিট কার্ড। বেড়াতে নিয়ে যেতেও চাইতেন। সব হল, কিন্তু অ্যাফ্লুয়েন্স উপভোগ করার জন্য একটা ইচ্ছুক মনও তো দরকার। আমাদের মা-মেয়ের তো সেটাই ছিল না। সম্পদের মধ্যে দুই বিষণ্ণ রমণী বাস করছি মাত্র। এলিয়েনের মতো। সমর বসুকে আমি মিস্টার নায়েকের লোক বলেই মনে করতাম। দু'জনে বাল্যবন্ধু, অনেক দিনের সম্পর্ক। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। সমরবাবু ডাকঘরের পিয়ন ছিলেন। সমরবাবু ওঁর বন্ধু হলেও মানুষটি এত নিরীহ আর ভদ্র যে, আমার ওঁকে বেশ ভাল লাগত। উনি এসে বন্ধুর সঙ্গেই কথাবার্তা বলতেন বটে, কিন্তু আমার সঙ্গেও যাওয়ার সময় খানিকক্ষণ গল্প করে যেতেন। আমি ওঁকে চা খাওয়াতাম। উনি যখন থাকতেন না, তখনও মাঝে-মাঝে এসে বসে গল্প করে যেতেন। একদিন হঠাৎ বললেন,

হারুর ট্র্যাপে পড়েছেন, বুঝতে পারছি। পাওনাগন্ডা আদায় করে নেবেন কিন্তু। ও সোজা পাত্র নয়। আমি থতমত খেয়ে বললাম, ওসব তো আমি বুঝি না, কী করতে হবে তাও জানি না। আশ্রয়ে আছি, এইটুকু শুধু জানি। উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আপনাকে দেখে সেটাই মনে হয় বটে। আপনি ওর সঙ্গে পারবেন না। আমি খুব সামান্য মানুষ, দুর্বলও বটে। আমার কোনও স্টেটাসও নেই, কিন্তু আমি কখনও আমার এই ধনী বন্ধুর কোনও অনুগ্রহ নিইনি। কোনও সুবিধে নেওয়ার চেষ্টাও করিনি কখনও, শত অভাবেও নয়। কাজেই ওর কাছে আমার কোনও দায় নেই। আপনার কোনও সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন। আমি ওর সব দোষ-দুর্বলতার খবর রাখি। সব রন্ধ্র জানি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ওঁকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না তাও জানি না। আর-একদিন বললেন, ডিভোর্সের আইন মেয়েদের প্রতি সদয়, কমলিকা ডিভোর্স দিতে চায় না, ফলে মামলা অনন্তকাল গড়িয়ে যাবে, আপনি হারুর বউয়ের মর্যাদা হয়তো কোনওদিনই পাবেন না। ফলে ওর কোনও উত্তরাধিকারও নয়। ভেবে দেখেছেন? আমি মাথা নাড়া দিয়ে বললাম, ভেবে কী করব বলুন, এর সমাধান তো আমার হাতে নেই। উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের হাতে যেটুকু আছে সেটুকু তো কাজে লাগানো যায়। দাঁড়ান, আমিও একটু ভেবে দেখি।

“আমার আর মিস্টার নায়েকের সম্পর্ক মোটে চার মাসের। লোকটাকে আমি তখনও ঠিক চিনে উঠতে পারিনি। এমনিতে ঠিকই আছেন, একটু মদ খাওয়া বা পার্টি করাটা কিছু খারাপ ব্যাপারও নয়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ত উনি আমার মেয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, সেটা খাবার টেবিলেই হোক বা একসঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময়েই হোক। পুরুষদের মনে দুষ্টুমি তৈরি হলে সেটা চোখেও উঠে আসে, আর মেয়েরা ওই চোখ খুব চেনে। আমার বুক দুরদুরুনির সেই শুরু। লোকটাকে শাসন করার সাধ্য তো আমার নেই। কী করব তবে? ভাবলাম কোনও হস্টেলে যদি পাঠিয়ে দিই! কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব! তার জন্যও তো মিস্টার নায়েকের সম্মতি চাই। তারপর দেখলাম উনি আমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করার জন্য দামি উপহার দেওয়া শুরু করলেন, সিনেমা বা জলসা বা নিকো পার্কে নিয়ে যেতে চাইতেন। আমার মেয়ে রাজি হত না এবং উনি বেশ হতাশ হতেন, রেগেও যেতেন। তারপরই ক্রমে আবরু খসতে লাগল, একদিন লং ড্রাইভে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি। মেয়ে শক্ত হয়ে রইল, লোকটাকে ও আগাপাস্তলা ঘেন্না করত। সেদিনই রাতে মাতাল হয়ে ফিরে, আমাকে সোজা বললেন, তোমার মেয়েটাকে আমার কাছে আসতে বলো। আজ রাতে ও আমার কাছে থাকবে। রীতিমতো হুকুম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, লোকটাকে একটা থাপ্পড় মেরে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যাই। তাই যদি পারতাম, তা হলে আর এত ভোগান্তি কেন বলুন! মেয়ে সব সময় নিজের আলাদা ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকত। এই ব্যাপারটা শুনতে পায়নি। তা হলে ভয়ে বোধ হয় হার্টফেল করত। আমি রেগে গিয়ে সেদিন একটু ঝগড়া করেছিলাম, বোধ হয় বলেছিলাম পুলিশের কাছে যাব। তাতে একটু সামলে গেলেন। কিন্তু পুরুষের প্যাশন ভয়ংকর জিনিস। সেটার জন্য বহুদূর যেতে পারে। উনি এরপর থেকে নানা উৎপাত শুরু করেন, আমার মেয়ের ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেওয়া, ভয় দেখানো, অনুনয়-বিনয় করা। তবে রক্ষা যে এটা শুধু মাতাল অবস্থাতেই করতেন, সোবার থাকলে নয়। তখন শুধু চোরা, লোভাতুর চাউনি। একদিন ব্যাপারটা আমি সমরবাবুকে বলে ফেলি। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। হারু তার সব সীমা লঙ্ঘন করেছে, এটা ঘোর অন্যায়। আমার কাছ থেকে টাকাপয়সার হিসেব চাইলেন, আমার কী

কী আছে বা নেই। তারপর চলে গেলেন। আমার যে খুব একটা ভরসা হল তা নয়। রোগা ছোটখাটো চেহারার একজন মানুষ, সম্বলহীন, মিস্টার নায়েকের সঙ্গে পাল্লা দেবেন কী করে? দিন দুই পরে এলেন, যখন মিস্টার নায়েক বেরিয়ে গেছেন, মেয়েও স্কুলে। এসে বললেন, আমি সব খোঁজখবর নিয়েছি, এই ফ্ল্যাটটার জন্য হারু প্রায় সব টাকাই দিয়ে ফেলেছে, সামান্য কিছু বাকি আছে। আমার মনে হয় হারু ফ্ল্যাটটা দিতে দেরি করবে না। ওর স্বার্থ আছে। তখন ফ্ল্যাটের জন্য আমি চিন্তা করছিলাম না, আমি তখন আমার মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভীষণ আপসেট। তাই বললাম, আমি ফ্ল্যাট চাই না, মেয়েকে নিয়ে পালাতে চাই। উনি খুব করুণ মুখে বললেন, কোথায় যাবেন? দেশে হারুর অভাব নেই। এক হারুর কাছ থেকে পালিয়ে আর এক হারুর পাল্লায় পড়ে যাবেন। আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারছেন না ঠিকই, কেউই করে না। আমি তো কোনও হিরো নই, তবে হারুর অন্ধিসন্ধি আমি জানি। এটুকুই যা ভরসা। আশ্চর্য ঘটনা হল, মিস্টার নায়ক মৃত্যুর তিনদিন আগে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটটা আমার নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে দিলেন। দলিলটা অবশ্য ওঁর কাছেই রেখে দিলেন। পরে সমরবাবু আমাকে বললেন, আপনি তো সোজা সরল মানুষ, হারুকেও চেনেন না, ফ্ল্যাটটা যে রেজিস্ট্রি করে দিল তার কারণ জানেন? এটা হল সাদা কথায় ঘুষ। আপনি তো নিশ্চই বোঝেন যে, ঘুষ মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়, তার প্রতিরোধের শক্তি হরণ করে। আপনি দুর্বল হয়ে পড়লে আপনার কচি মেয়েটির দখল নেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। আমি ওর স্ট্র্যাটেজিগুলো জানি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কী সর্বনাশ ! আমি এই ফ্ল্যাট চাই না তো! আজই মিস্টার নায়েককে বলে দেব ফ্ল্যাট উনি ফিরিয়ে নিন। উনি হাত তুলে বললেন, আবার বলছি, আপনার আর আপনার মেয়েটির যাতে বিপদ না হয় তা আমি দেখব, আর-একটু সময় দিন। আমি দুর্বল মানুষ, একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে আমার তো একটু সময় লাগবেই। কথাটার মানে আমি বুঝলাম না, কী সিদ্ধান্ত, কেন সিদ্ধান্ত তা তো জানি না। ভরসাও হল না। তবে অপেক্ষা করা ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারি! যেদিন উনি মারা যান তার আগের দু'দিন উনি আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন। বেশি মদ খাননি, অনেক গল্প-টল্প করেছেন। আমার মেয়েকে বললেন, ভাল করে লেখাপড়া করো, আমি তোমাকে বিদেশে লেখাপড়া করতে পাঠাব। সেটাও ওঁর স্ট্র্যাটেজি কি না কে জানে। আমাকে বললেন, তোমার ফ্ল্যাটটা এবার একজন ইন্টিরিয়র ডেকরেটরকে দিয়ে সাজিয়ে দেব। আমরা এসব মনভোলানো কথায় অবশ্য বিপদের আঁচই পাচ্ছিলাম। যেদিন মারা গেলেন সেদিন সারারাত ওঁর সাউন্ড স্লিপই হয়েছে। পাশে শুয়ে আমি তো অন্তত কোনও অস্বাভাবিকতা টের পাইনি। ভালই ছিলেন। সকালে আমি রোজই ওঁকে বেড-টি নিজেই করে দিতাম, সেদিনও দিয়েছি। উনি চা খেলেন, একটু হাসিঠাট্টাও করেছিলেন, মনে আছে। মুড বেশ ভাল ছিল। তারপর কাজের মেয়েরা এল আর আমিও গেরস্থালি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সমরবাবু সেদিন হঠাৎ সকালেই এসে হাজির। ওঁর অবশ্য আসার কোনও বাঁধা সময় ছিল না, তবে সকাল সাড়ে আটটা-ন'টায় কখনও আসেননি। সোজা বন্ধুর ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি চা পাঠিয়ে দিলাম, আর কিছু জানি না। বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। কখন গেলেন তা জানি না। উনি একটু বেলায় ব্রেকফাস্ট খেতেন, সাড়ে দশটা-এগারোটা, লাঞ্চ করতেন না। ব্রেকফাস্ট রেডি করে আমি মিস্টার নায়েককে ডাকতে গিয়ে দেখি উনি তখনও শুয়ে, কাছে গিয়ে গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকতে গিয়ে লক্ষ করলাম মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। জ্ঞান নেই বললেই হয়। অস্পষ্ট গলায় একবার যেন বললেন, সমরকে ডাকো। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। সমরবাবু যখন এলেন তখন উনি নিথর হয়ে গেছেন। সমরবাবু ওঁর

নাড়ি দেখলেন, বুকে হাত দিয়ে দেখলেন, শ্বাসও চলছিল না। সমরবাবু একদম পাথরের মতো বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগলেন, একটু আগেও তো ছিল, একটু আগেও তো ছিল। এখানে আমরা নতুন। মিস্টার নায়েকের বাড়ি সল্ট লেকে। আমাদের বাড়ি ছিল বেলেঘাটা। এখানকার ডাক্তার-বদ্যি কাউকে চিনি না। সমরবাবুই একজন ডাক্তারকে ফোন করে আনালেন। তিনি এসে দেখে বললেন, উনি মারা গেছেন। আমি এতটাই বিভ্রান্ত ছিলাম কিছুই তেমন করে লক্ষ করিনি। কী যে সব হচ্ছিল, সমরবাবু না থাকলে আমি অথই জলে পড়তাম। বান্টিবাবু এখানকার নেতাগোছের লোক, মিস্টার নায়েকের বন্ধু, এই ফ্ল্যাটটাও ওঁরই জোগাড় করা। সমরবাবু তাঁকেও খবর দিয়ে আনালেন। মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল, কী কারণে তাও আমি বলতে পারব না। মিস্টার নায়েকের সঙ্গে আমার তো সেরকম ঘনিষ্ঠতা নয় যে, ওঁর সব খবর রাখব! ওঁর কী অসুখ ছিল, কী ওষুধ খেতেন তাও আমি ভাল জানি না। ওঁর নিজের ওষুধের দোকান থেকেই ওষুধ আসত দেখেছি। মৃত্যুর পর ওঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম সমরবাবু বন্ধুকে প্রায় আঁকড়ে বসে আছেন, খুব যত্ন করে তুলোর প্যাড দিয়ে মুখের গ্যাঁজলা মুছিয়ে দিচ্ছেন। মৃত্যুর পরবর্তী সিনারিওতে আমার বা আমার মেয়ের কোনও ভূমিকাই নেই। বান্টিবাবু আর সমরবাবুই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়েছিলেন। আমরা শুধু দর্শক। ওঁর স্ত্রী বা ছেলেদের কেন সময়মতো খবর দেওয়া হয়নি তাও আমি জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম ওঁর স্ত্রী আর ছেলেদের ওপর বান্টিবাবু বা সমরবাবু কেউই খুশি ছিলেন না। ওঁর স্ত্রী নাকি ওঁকে গুন্ডা লাগিয়ে খুন করারও চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেরা ওঁর মুখদর্শন করত না। মিস্টার নায়েক নাকি বান্টিবাবুকে বলেছিলেন, আমার ভালমন্দ কিছু হলে আমার বউ-ছেলে কালীঘাটে পুজো দেবে। ওঁর ক্রিমেশন হয়ে গেল, আমরা ঘটনাটায় এত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের কী করা উচিত তা বুঝতে পারছিলাম না। উনি আমাদের আত্মীয় নন, হৃদয়গত সম্পর্কও হয়ে ওঠেনি, ওঁর মৃত্যুতে আমাদের অশৌচও পালন করার নেই, শোকও হচ্ছে না, কিন্তু একটু ভয় হচ্ছিল। অজানা ভয়। এবার কী হবে, কিছু খারাপ ঘটবে না তো! আর সেটাই ঘটল। হঠাৎ খবর পেলাম ওঁর স্ত্রী খুনের মামলা করেছেন। আমি আর আমার মেয়ে মিলে নাকি ওঁকে খুন করেছি। তিন-চার দিন পরে সকালের দিকে দু'জন পুলিশ অফিসার এসে আমাদের অনেক জেরা করলেন। ওঁর মৃত্যুর খবর কেন ওঁর পরিবারকে জানানো হয়নি, মৃত্যু কীভাবে হল, কে সামনে ছিল, উনি কী কী ওষুধ খেয়েছিলেন, আমি ওঁর কে হই, কেন ওঁর সঙ্গে অবৈধভাবে থাকতাম, আমার স্টেটাস কী, ভাড়াটে মেয়েমানুষ কি না, ফ্ল্যাটটা কার নামে, ডাক্তার রায়কে কত টাকা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট আদায় করা হয়েছে, আমি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করতাম কি না, ফ্ল্যাটটা আমার নামে রেজিস্ট্রি হওয়ার ঠিক পরেই ওঁর মৃত্যু হল কেন, হঠাৎ আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে এত টাকা জমা পড়ল কেন, শ্মশানবন্ধু কারা ছিল, আমি এ লাইনে কত দিন আছি, এর আগে আর কারও সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছি কি না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন। একই প্রশ্ন একাধিকবার। তারপর তারা ওঁর ঘরে গিয়ে ওষুধপত্র দেখল, কাগজপত্র দেখল, ঘরটা সিল করে রেখে গেল। আমার মেয়েকেও বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছে, তার মধ্যে একটা ছিল, মিস্টার নায়েককে ও বাবা বলে ডাকত কি না, কী বলে ডাকত এবং রিলেশন কেমন ছিল। শেষে আমাকে বলল, আপনি নিজেকে যতটা ইনোসেন্ট দেখাতে চাইছেন, আপনি কিন্তু ততটা ইনোসেন্ট নন। আরও ইন্টারোগেশন হবে, তৈরি থাকবেন। পরশুদিন আবার এসেছিল। ফ্ল্যাটের কাগজপত্র দেখতে চাইল। আমি বললাম আমার কাছে কিছু নেই, সব ওঁর ঘরে। আমার স্বামী নীলাঞ্জন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল, সুইসাইড না মার্ডার, রিলেশন, লাভ ট্রায়াঙ্গাল কি না,

অনেক কিছু। খেই হারিয়ে ফেলছিলাম, জীবনে এত কঠিন পরীক্ষা তো দিতে হয়নি। আর এত অপমান! তবে আমি যা করেছি, যে সব ভুল, তাতে আমার জীবন তো সুখের হওয়ার কথা নয়। অপমানের জন্য তৈরি থাকতেই হবে। মোটামুটি কলগার্ল বা বেশ্যার ছাপ্পা অলরেডি লেগেই গেছে গায়ে। এখন খুনির ছাপ্পাটাও বোধ হয় বাকি থাকবে না। আমার বয়স এখন একচল্লিশ, মনে হচ্ছে একাশি। নিজের যা হোক, আর ভাবছি না, শুধু মেয়েটার জন্যই যা কিছু চিন্তা। আমার জেল হলে ওর কী হবে। এই ফ্ল্যাটটাও নাকি ওরা দাবি করবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের আশ্রয়ও থাকবে না। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে বলে শুনছি। আমরা প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। শুনলাম মিস্টার নায়েকের ঠোঁট নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল আর মুখে বাবলও ছিল। আমি জানি না, ডেডবডি আমি ভাল করে দেখিনি। বিষ যদি উনি খেয়েও থাকেন সেটা আমার দেওয়া নয়। তবে আমার কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন। লোকের চোখে আমার আর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। কেন আপনাকে এত কথা বলছি জানি না। আপনাকে তো আমি একবার মাত্র দেখেছি, মিস্টার নায়েকের ডেডবডি ক্রিমেশনের জন্য নিতে এসেছিলেন, খুব লম্বা একটি ছেলে। নামও জানতাম না। সমরবাবু বললেন, আপনি একজন ভাল লোক। তাই হবে। আপনার মুখ দেখে ভালমানুষ বলে মনে হয়। আর তাই বোধ হয় অনর্গল এত কথা আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আজকাল একজন ভাল লোকের দেখা পাওয়াটাও ভাগ্যের কথা। আমি আজকাল যার দিকে তাকাই তাকেই ভয় পাই। কারও চোখে রাগ, কারও চোখে ঘেন্না, কারও চোখে সন্দেহ, কারও চোখে কাম। এই যে আপনার সামনে বসে আছি, আমি আর আমার মেয়ে, আমার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না। ইউ হ্যাভ আ গুড ভাইব্রেশন।”

আলুথালু দু’জন মহিলা ডিভানের ওপর গায়ে-গায়ে বসে আছে। মেয়েটার পরনে আজও সাদা একটা লম্বা নাইটির মতো কিছু, যেটা ময়লা হয়ে গেছে, ব্রাউনরঙা চুল এলোথেলো, কোনও সাজ নেই, দু’খানা নীলচে চোখে অতলান্ত ভয়, আর তামসীও একটা ইস্তিরিহীন ফ্যাকাসে গোলাপি রঙের হাউসকোট পরে আছেন, চিরুনিহীন চুল যথেচ্ছ প্রলম্বিত, চোখে এক অসহায় বৈরাগ্যের দৃশ্যহীন দৃষ্টি। ডান হাতটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছে যক্ষিবুড়ির মতো। বাঁ হাত কোলের ওপর, শিথিল করতলে ধরে রাখা একটা নিশ্চুপ মোবাইল ফোন, যেটাতে গত চল্লিশ মিনিটেও কোনও কল আসেনি। মেয়েটি যৌবনের চৌকাঠে, তামসী যৌবনের প্রান্তিক রেখায়, তবু যেন মনে হচ্ছে দু’জনকেই ছেড়ে গেছে তাদের ফলন্ত বয়স। শীতের রিক্ততা তাদের সর্বাঙ্গে।

রজত কথা খুঁজে পাচ্ছিল না, যেমনটা তার প্রায়ই হয়ে থাকে। কথার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের আড়াআড়ি। এক-এক সময় তার মন বোবা হয়ে যায়, সেখানে কোনও কথার বুদ্বুদ ভুড়ভুড়িই কাটে না। ভিতর তখন সাইলেন্স জোন। একটা বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করছিল সে, পুরনো দিনের টাইপ সেটিং কম্পোজিটারদের মতো, অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, কিন্তু কোনও অর্থবহ বাক্য তৈরি হল না তো! মেয়েটা, ইলিনা, তার মধুরঙা চুল আর মায়ের কাঁধের আড়াল থেকে একটুখানি মুখ বের করে চেয়ে আছে তার দিকে, সেই কখন থেকে, একদৃষ্টে। একটাও কথা বলেনি।

অবশেষে তার মুখ দিয়ে যে বাক্যটা বেরোল সেটা তার বলার কথাই নয়, সেটা অনেকটাই অর্থহীন, তার ইচ্ছাকৃতও নয়। সে খুব মৃদু স্বরে বলল, “কিচ্ছু হবে না। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।”

তামসী করুণ, শুষ্ক ও সুন্দর মুখখানা তুলে বললেন, "আপনি বলছেন! জানি না কী করে এত সমস্যা মিটে যাবে! আপনি ভাল মনের মানুষ, তাই বললেন! এ কথাটাও তো কেউ বলে না!"

যখন উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে তখন হঠাৎ, আচমকা তার সরু পাখির মতো গলায় মেয়েটা, ইলিনা বলল, "তোমার ফোন নম্বরটা আমাকে দেবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"

গুড্ডু বলে, "পলিটিশিয়ানদের মুখে কোনও এক্সপ্রেশন থাকে না, বুঝলি। প্র্যাকটিসের ব্যাপার। লোকে যদি তোর মুখ দেখে মনের ভাব বুঝেই যায়, তা হলে আর তুই কিসের ডিপ্লোম্যাট? বান্টি নস্করকে দেখ, বাড়িতে আগুন লাগলেও বান্টি নস্করের মুখে কোনও ভাবান্তর পাবি না।"

গুড্ডু ভাবী পলিটিশিয়ান, বান্টিদার চেলা এবং ভাবশিষ্য। পদে পদে বান্টি নস্করকে নকল করতে করতে গুড্ডুর হাঁটাচলা, কথার স্টাইল, মুদ্রাদোষ অবধি বান্টিদার মতো হয়ে যাচ্ছে। তবে এ কথা ঠিক যে, বান্টি নস্করের মুখে কোনও এক্সপ্রেশন নেই। মুখটা থোম্বামতো, নাকটা ভুঁড়ো, পুরু ঠোঁট, চোখে কোনও ভাষা নেই। ভাবলেশহীন। পিকাসোর ছবি, লতা মঙ্গেশকরের গান, কেষ্টনগরের সরভাজা বা টাইগার হিলের সূর্যোদয় সবকিছুতেই সমান ডিটাচমেন্ট অতি বিরল গুণ, যা বান্টি নস্করের আছে। গুড্ডু ভুল বলে না।

সব শুনে গুড্ডু বলল, "সামনে বাই ইলেকশন, তারপর মিউনিসিপালিটির ভোট, পার্টির জোনাল কমিটির কনভেনশন, বান্টিদা এখন কি পুলিশ কেসে নাক গলাতে পারে, প্রোটোকল বলেও তো একটা ব্যাপার আছে! পলিটিশিয়ানদের অনেক ক্যালকুলেশন করে পা ফেলতে হয়। তামসী ম্যাডাম বান্টিদাকেও ফোন করেছিল, বান্টিদা বলেছে, দেখছি কী করা যায়। চল, বান্টিদা কী বলে শুনে আসি।"

তাই আজ সকালে তারা বান্টি নস্করের অফিসে এসে বসে আছে। বান্টিদা সাইটে গেছে, এল বলে। পাশাপাশি দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে তারা বসা। গুড্ডু বলছিল, "এবার বান্টিদা আমাকে লোকাল কমিটিতে ঢুকিয়ে নিচ্ছে বুঝলি! সামনে অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। দুঃখ কী জানিস, লাইফটা অন্যরকম হয়ে যাবে, আগের মতো আর কোয়ালিটি টাইমটা পাব না..."

দুঃখটা অবশ্য গুড্ডুর মুখভাবে ফুটে উঠছে না, বরং এই দিনেদুপুরেও ভাঙাচোরা নীরস মুখটা স্বপ্নাতুর হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। গুড্ডু স্বপ্নই দেখছে বোধ হয়। এমএলএ হওয়ার স্বপ্ন। শুধু তারই কোনও স্বপ্ন নেই। কেন নেই তা সে বুঝতে পারে না। তার যেন কিছুই হওয়ার নেই, কিছুই অর্জন করার নেই, কিছুই পাওয়ার নেই। বাবা তাকে ইদানীং জোর করে অফিসে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যাবসা বোঝানোর চেষ্টা করছে। বাবা বলছে, এটা তোর বাবারও ব্যাবসা, মনে রাখিস। মনে রাখার চেষ্টাও সে করে, হয় না। অচল গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালানোর মতো একটা কিছু হয় মাত্র। তার ভিতরে কোনও সেল্‌ফ স্টার্টার নেই।

বান্টি নস্কর এল। মোটা মানুষ, ঘেমে গেরুয়া পাঞ্জাবিটা গায়ে লেপটে আছে, তলার স্যান্ডো গেঞ্জি অবধি ফুটে উঠেছে, শ্বাস পড়ছে ফোঁস-ফোঁস করে। সঙ্গে দু'জন চেলা বা কর্মচারী কেউ হবে। তারা কিছু কাজের কথা বলে চলে যাওয়ার পর বান্টি তাদের দিকে চেয়ে বলে, "কী রে, তোরা এই সাতসকালে! কী ব্যাপার?"

গুড্ডুই বলল, "বান্টিদা, সেই হারাধন নায়েকের কেসটা নিয়ে কি কিছু হল?"

রিমোটে ঘরের এসিটা এক ঘাট বাড়িয়ে দিয়ে বান্টি বলে, "ও আর কী হবে। হারু বন্ধুমানুষ ছিল বলে যা করার করেছি। কিন্তু কাজটা তো হারু ভাল করেনি। একস্ট্রা ম্যারিট্যাল রিলেশনটা লোকে ভাল চোখে দেখে

না। গ্রিন ভ্যালির কয়েকজন তো অলরেডি ওদের ওখানে থাকা নিয়ে আপত্তি তুলেছে। হারুর বউ বড় উকিল লাগিয়েছে বলে শুনছি, পুলিশকেও অ্যালার্ট করেছে। পুলিশ আমার কাছেও এসেছিল। আমি অবশ্য বলে দিয়েছি যে, ফাউল প্লে বলে আমার মনে হয়নি, ইট ওয়াজ় আ নর্মাল ডেথ। হারুর তো অনেকরকম অসুখ ছিল, গাদা-গাদা ওষুধ খেত। মার্ডার চার্জ হয়তো টিকবে না, কিন্তু বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হবেই, কমলিকা সোজা মেয়েছেলে নয়। হারুকে ভাজা-ভাজা করে ছেড়েছে। মরার পরেও শোধ তুলছে। আর হারুও বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। নব্বই লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাট, এক কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট ট্রানসফার! সোজা কথা! তোরা কি কিছু বলতে এসেছিস?"

গুড্ডু বলল, "না, তেমন কিছু না। পুলিশ কি আমাদেরও জেরা-টেরা করবে নাকি?"

"মনে তো হয় না। মার্ডার চার্জটা স্ট্রং নয়। তবে কিছুই বলা যায় না। জেরা করলে ওই কথাই বলতে হবে, নাথিং অ্যাবনর্মাল। রাজু, তুই কিছু বলতে চাস? শুনলাম, তুই গতকাল তামসীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলি!"

"হ্যাঁ, বান্টিদা। আমি শ্মশানবন্ধু ছিলাম বলে উনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন। উনি জানতে চেয়েছিলেন আমরা ডেডবডির কোনও অ্যাবনরম্যালিটি দেখেছি কি না। কারণ, পুলিশ খুন সন্দেহে ওঁদের হ্যারাস করছে। খুব ভয় পেয়েছেন দেখলাম। খুব হেলপলেস।"

বান্টি একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, "হেলপলেস তো বটেই। মেয়েটা হারুর ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছিল তো! আমরা পলিটিক্স করি, মাঝে-মাঝে কিছু উলটোপালটা কাজও করতে হয়। কিন্তু হারু ছিল ক্রিমিনাল মাইন্ডেড। প্লেবয়, মেয়েবাজ। আমার সন্দেহ, তামসীর জন্য হারুই নীলাঞ্জনকে খুন করেছিল। এখন তো মেয়েটাকে সাফার করতেই হবে। আমাদের কিছু করার নেই। আর কিছু বলল?"

"না। উনি ধরেই নিয়েছেন যে, পুলিশ ওঁকে অ্যারেস্ট করবে এবং ওঁর মেয়েটা ভেসে যাবে। ওঁর ধারণা যে, ওঁকে সবাই ঘেন্না করছে, ওঁকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। তামসী ম্যাডাম কিন্তু আমার কাছে কোনওরকম হেলপ চাননি। ওঁদের কোনও বাড়িঘর বা সোর্স অফ ইনকাম নেই। ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা তোলার উপায় নেই। কারণ, ওঁর কাছে চেকবই বা এটিএম কার্ড নেই। সেসব হারাধনবাবুর ঘরে, আর ঘরটা পুলিশ সিল করে গেছে। ওঁর মেয়েটার বয়স বোধ হয় ষোলো-সতেরো, আনপ্রোটেকটেড। আর ম্যাডামকে যে-কোনও সময়ে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হল ম্যাডাম সব খেলায় হেরে বসে আছেন, টোটাল ডিফিট।"

বান্টিকে একটু চিন্তিত দেখাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, "রাজু, তুই কি কিছু সাজেস্ট করতে চাস?"

"না বান্টিদা, আপনি তো বলেই দিলেন যে, তামসী ম্যাডাম ওয়াজ় ট্র্যাপড। আমি আর কী বলব! আমার মনে হয়েছে উনি ইনোসেন্ট। তবে সেটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।"

বান্টি উদ্গার আর দীর্ঘশ্বাসের মাঝামাঝি একটা শব্দ করল। তারপর বলল, "আবার নতুন করে একটা ফ্যাঁকড়া তুললি। তুই আর-পাঁচটা ছেলের মতো ফচকে নোস, কথাটাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। আমি এইসব নোংরামোতে জড়াতে চাইছিলাম না, কিন্তু তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে একবার বোধ হয় তামসীর কাছে যাওয়া উচিত। কী বলিস?"

রাজু বড়-বড় চোখ করে চেয়ে বলল, "যাবেন? গেলে হয়তো আপনার মনখারাপ হয়ে যাবে। আমিও ভাবছিলাম আর ওদের কাছে যাব না, কিছু যখন করতে পারব না, তখন গিয়ে কী লাভ! তা ছাড়া একটা টিনএজার মেয়ে আছে, ঘন-ঘন যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।"

না, একথাটা ঠিক নয় যে, বান্টি নস্করের কোনো এক্সপ্রেশনই নেই। আছে। খুব রেয়ার যদিও, তবু বান্টিকে কখনও-কখনও গভীরভাবে চিন্তিত দেখায়। আর, আরও রেয়ার হল বান্টি মাঝে-মাঝে মুচকি হাসে। এই এখন যেমন। বান্টি হাসিটা ধরে রেখেই বলে, "তুই তো জানিস, তোর বাবা সত্যস্যার একসময়ে আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন। ওরকম অনেস্ট আর ইমপারশিয়াল লোক বেশি দেখিনি। তোর বাবা মারা যাওয়ার পর তোকে তুলে নিয়ে এসে নিজের ছেলের মতো মানুষ তো করলেনই, যখন বাড়িটা প্রোমোট করার জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন বললেন, রাজুর নামেও একটা ফ্ল্যাট হবে। শুনে আমি ওঁকে একটা প্রণাম করে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম, স্যার, আজকালকার পক্ষে আপনি বড্ড বেমানান, তবু বলি, আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার মতো এরকম একটা মন আমারও হয়। তুই স্যারের নিজের ছেলে নোস বটে, কিন্তু স্যারের ছায়া আছে তোর ওপর।"

এক সকালে সমর বসু আবার এলেন। সন্ধ্যা এসে খবর দিল, "ও দাদা, দ্যাখো গে সেই সেদিনকার মরকুটে লোকটা আবার এসেছে। ভিতরে আসতে বললুম, কিছুতেই এল না। বলল, ওঁর হয়তো ডিস্টার্ব হবে।"

রজত উঠে গেল। দেখল, সমরবাবু রোগার মধ্যেও আরও একটু রোগা হয়েছেন। সেটা যে সম্ভব সেটা কয়েকদিন আগেকার সমর বসুকে দেখে তার মনে হয়নি। আজ তাই ভারী অবাক হল সে। ভয় হল, আরও রোগা হলে সমর বসু হয়তো অদৃশ্য হয়ে যাবেন। রজত কারও চেহারা নিয়ে মন্তব্য করা পছন্দ করে না।

তাই শুধু বলল, "আসুন। কিছু বলবেন?"

সেই সেদিনকার মতোই ভারী বিগলিত হয়ে, সিঁড়ির গোড়ায় জুতোজোড়া ছেড়ে, তেমনই দু' পায়ের ফাঁকে ছাতাটি দাঁড় করিয়ে, তাতে দু'টি হাতের ভর দিয়ে, অনুপ্রবেশকারীর মতো সসংকোচে সেই প্লাস্টিকের চেয়ারটাতেই বসলেন।

"আপনাকে নমস্কার জানাতে এলাম। আমার কথায় তো কেউ গুরুত্ব দেয় না, এই আপনি দিলেন, তামসী ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করলেন। এ বড় ভাল হল। আপনার উদ্যোগেই বান্টিবাবু তামসীর সঙ্গে দেখা করেছেন, ওঁদের সংকটও হয়তো কিছুটা কেটেছে।"

"সেটা কীরকম?"

"আপনাকে বলেছিলাম, আমার স্ত্রী আমাকে মাঝে-মাঝে নেংটি ইঁদুর বলে উল্লেখ করেন। উপমাটি আমার যথার্থ বলেই মনে হয়। ইঁদুরের মতোই তুচ্ছ প্রাণী বলেই কেউ আমাকে লক্ষ করে না এবং আমি সর্বত্রগামী। তামসীর ওপর পুলিশের সন্দেহ দেখে আমার মনে হয়েছিল সত্যটা এবার উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। তাই মনস্থির করে নিজের অপরাধ কবুল করার জন্য আমি একদিন সকালেই থানায় গিয়ে হাজির হই। বড়বাবুর ঘরে ঢুকে নমস্কার করে আমি বললাম, "স্যার, আমি একটা এজাহার দিতে এসেছি।"

উনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, "কীসের এজাহার?"

আমি জোড়হাত করে বললাম, "আমি আমার বন্ধুকে খুন করেছি, স্বীকারোক্তি দিতে চাই।"

উনি বড়-বড় চোখ করে বললেন, "খুন! সে তো কার্ডিনাল অফেন্স! ঠিক আছে, আপনি বাইরের বেঞ্চে গিয়ে বসুন, মহীতোষবাবু এলে এজাহার নেবেন।"

আমি বাইরের বেঞ্চে বসে রইলাম। ঘণ্টা দুই পরে মহীতোষবাবু এলেন। একজন সেপাইকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মোটাসোটা লোকটিই মহীতোষবাবু। তিনি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ কথা-টথা কইলেন। বেরিয়ে আসতেই আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, "স্যার, আমি একটা খুন করেছি, কনফেশন দিতে চাই।"

উনি একটা ফাইল খুলে কী যেন দেখছিলেন। বললেন, "তাই নাকি! তা কাকে খুন করেছেন, বউকে নাকি!"

আমি বললাম, না স্যার, বন্ধুকে। উনি বললেন, ঠিক আছে, একটু বসুন। ডেকে পাঠানো হবে। আরও ঘণ্টা দুই বসে থাকার পর আমার খুবই খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তাই গিয়ে মহীতোষবাবুর ঘরে ঢুকে হাতজোড় করে বললাম, "স্যার, আমার সেই খুনের এজাহারটা!"

উনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "এজাহার লেখে কানাই। সে আসুক, তারপর দেখা যাবে। থানায় এলে হাতে সময় নিয়ে আসতে হয়, বুঝলেন। অপেক্ষা করুন।"

আরও ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার গিয়ে বড়বাবুর ঘরে ঢুকে বললাম, "স্যার, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি তা হলে আসি?"

উনি হাতের একটা নাড়া দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন।"

আমিও চলে এলাম। ইনসিগনিফিক্যান্ট হওয়ার এই একটা সুবিধে। ওঁরা বিশ্বাসই করলেন না আমি একটা খুন করেও থাকতে পারি। পাগল-টাগল মনে করে খুবই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেন। খুবই মনোকষ্ট নিয়ে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখনই সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল। সোনার তরী হাউজিংয়ের রাঘব চাটুজ্জে একটি খবরের কাগজের ফিল্ম ক্রিটিক। পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে তাঁর খুবই দহরম-মহরম। একদিন দেখলাম বান্টিবাবু তাঁকে নিয়ে লালবাজারে গেলেন। বোধ হয় কিছু কলকাঠি নাড়াচাড়া হল। আর তার পরই তামসীর ওপর থেকে পুলিশের ছায়া সরে গেল, সিল করা ঘরটিও খুলে দেওয়া হয়েছে। তামসী আপনাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

রজত অবাক হয়ে বলে, "আমাকে! আমি তো কিছুই করিনি! তা হলে কৃতজ্ঞতা কিসের?"

"তা আমি জানি না। হয়তো ওঁর ধারণা হয়ে থাকবে যে, এই ঘটনাবলির পিছনে আপনার প্রচ্ছন্ন হাত আছে। থাকাই স্বাভাবিক। যাই হোক, তামসী এখন মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ক্ষীণ হাসিও হাসেন। আমি গেলে চা করে দেন, সঙ্গে বিস্কুট। মেয়েটিও বিষণ্ণ মুখে স্কুলে যায়। ওরা চুলও আঁচড়াচ্ছেন, জামাকাপড়ও আগের চেয়ে পরিচ্ছন্ন। আমার মনে হল, এই সংবাদটুকু আপনাকে দেওয়া প্রয়োজন।"

রাজু অন্যমনস্ক গলায় বলে, "ওঁরা তো এখন অ্যাফ্লুয়েন্ট।"

তামসীকে আমি সেটাই বলতে চেয়েছিলাম। উনি বললেন, "আমি ওঁর স্ত্রী নই, উত্তরাধিকারীও নই, আমাদের বাঁচার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুর বেশি আমি কিছু নিতে পারি না। আমার মেয়ে তো এটুকুও নিতে আমাকে বারণ করছে। বাধ্য হয়ে নিচ্ছি।"

রাজু তেমনি আনমনে বলল, "হুঁ।"

"আপনার যদি অনুমতি হয় তা হলে আর দু'-চারটি কথা বলতে পারি কি?"

"বলুন না!"

"আমি বড়ই মনোকষ্টে আছি। এখন আমার আর কোনও বন্ধু নেই। আমি গেলে হারাধন বড় খুশি হত। বলত, "আয়, আয়, বোস। কেমন আছিস?" এখন আর আমাকে কুশল প্রশ্নটুকু করারও কেউ নেই। বড্ড একা লাগছে। যে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আমাকে বাড়ি-বাড়ি যেতে হয়, সেটা হঠাৎ বড্ড ভারী-ভারী লাগে আজকাল, টানতে কষ্ট হয়। সাইকেলে প্যাডেল করতে গিয়ে যেন পায়ে আগেকার মতো জোর পাই না। এই আমার মতো যারা দুনিয়ার মার্জিনাল এনটিটি, বাহুল্য, বর্জ্য এবং অনভিপ্রেত, তাদের জন্যও ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা, যাই বলুন, কিছু ছোট-ছোট আনন্দের উৎস এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রাখতেন। এই যেমন ধরুন, এক বাড়িতে একটা পার্সেল ডেলিভারি দিতে গেছি, এক বয়স্কা বিধবা মহিলা দরজা খুলে পার্সেলটা সই করে নিয়ে বললেন, "তুমি জুতো খুলে ঘরে এসে একটু বোসো তো বাছা, বড্ড কাহিল লাগছে তোমাকে।"

আপত্তি শুনলেন না, ঘরে গিয়ে বড় জড়সড় হয়ে বসলাম। এসি চলছিল। উনি যত্ন করে প্লেটে দুটো নাড়ু আর দুটো মোয়া আর একগ্লাস ঠান্ডা জল দিলেন। বললেন, "আমরা দেশগাঁয়ের মানুষ বাবা, বাড়িতে ডাকপিয়ন এলে বরাবর বসিয়ে জল-টল দিয়েছি, শহরে সেসব রেওয়াজই নেই। এখানে সব কেমনতরো যেন।"

আমার চোখ জলে ভরে গেল কেমন এক আবেগের ঠেলায়, আর সেই মোয়া আর নাড়ুর স্বাদ যেন আজও মুখে লেগে আছে। সে তো আর শুধু খাদ্যবস্তুই ছিল না, তাতে মাখানো ছিল মহার্ঘ মায়া। তারপর ধরুন সলিলবাবুকে একটা মানিঅর্ডার দিয়ে চলে আসছি, উনি পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন, "ওহে সমর, তুমি তো আমাকে একশো টাকা বেশি দিয়েছ!" আমি আপাদমস্তক শিহরিত হয়ে গিয়েছিলাম ওঁর মুখে সমর ডাকটা শুনে। কবে কখন নামটা জেনেছেন এবং মনেও রেখেছেন! এটা আমাদের মতো মানুষের কাছে যে কত বড় রেকগনিশন, তা আপনি বুঝবেন না। একশো টাকা ফেরত পাওয়ার চেয়েও তা ঢের ঢের বেশি। এত আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম! কী বলব! তারপর ধরুন একদিন রাতে ভাত খেতে বসেছি, হঠাৎ আমার স্ত্রী আমার পাতে একটা পোস্তর বড়া দিলেন। পোস্ত আমাদের কাছে আকাশের চাঁদের মতোই দূরের জিনিস। আমি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত। অশ্রদ্ধার সঙ্গেই দিলেন, কিন্তু দিলেন তো! অনেকে পোস্ত হয়তো রোজই খায়, কিন্তু সেই রাতে আমি পোস্তর ভিতরে যে অপার্থিব স্বাদ পেয়েছিলাম, তা আর ক'জন পায় বলুন! ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা আমাদের মতো বাহুল্যদের জন্যও এরকম কিছু ছোট-ছোট আনন্দের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু কী বলব, এখন আমি সেই আনন্দগুলোও আর পাচ্ছি না। ব্যাগ বড় ভারী, সাইকেল গতিহীন, কুড়িয়ে পাওয়া আনন্দগুলো নিরুদ্দেশ। বড় মনোকষ্টে আছি, রাজুবাবু। আমার তো এসব কথা বলার জায়গা নেই, তাই ভাবলাম, রাজুবাবুকে বলি। তিনি ঠিক শুনবেন।"

৬

“তোমাকে দেখছি বয়সটার সঙ্গে কিছুতেই তোমার বনিবনা হচ্ছে না। এখন কি তোমার জোয়ানবয়সিদের মতো গ্যাটম্যাট করে চলাফেরা সইবে? হুড়যুদ্ধু করা তোমার চিরকালের স্বভাব। কত কী হতে পারত বলো তো!”

“আরে না, সেদিন হুড়যুদ্ধু কিছু করিনি, সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, আজ কত তারিখ সেটা জানতে একবারই একটু ঘাড় ঘুরিয়ে ডান দিকের দেওয়ালে ক্যালেন্ডারটা দেখবার চেষ্টা করেছিলাম, সিম্পল ব্যাপার, কোনও অ্যাডভেঞ্চার করিনি, তাতেই কী যে হয়ে গেল! লাট্টুর মতো পাক খেয়ে, চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে এমন গাধার মতো লাগছিল তখন! কেন পড়ে যাচ্ছি, কী এমন নিয়ম ভাঙলুম, ভাবতে ভাবতেই পড়ে হাতে চোট, কোমরে চোট, মাথাটাও দেয়ালে ঠুকে গিয়েছিল। রাগ হয় কি না বলো নিজের ওপর, দুনিয়ার ওপর!”

“অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে শুনলাম।”

“ওরা তো তাই বলে। হয়তো দু’-একমিনিট একটু ব্ল্যাকআউট হয়েছিল, তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়। সঙ্গে-সঙ্গেই আমি সামলে গেছি। রাজু এসে ধরে তুলছিল, আমি বারণ করলাম, ধরিস না। নিজেই পারব। বলে উঠতে গিয়ে দেখি ডান হাঁটুটা ফেল মেরেছে। তখন রাজু পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল আর শুয়ে-শুয়ে তিনদিন ধরে মনে-মনে নিজেকেই গালাগাল করে যাচ্ছি, গাধা, গোরু, কচ্ছপ, নিনকমপুপ, আরও কত কী! আর জয়তিকে তো জানোই, আমার পতনজনিত উত্তেজনায় ননস্টপ পাড়া জানান দিয়ে চেঁচামেচি করে যাচ্ছে।”

“ডাক্তার কী বলল?”

“ওরা যা বলে এবং চিরকাল বলে আসছে। নো সাডেন টার্নিং, নো সাডেন মুভমেন্টস, নো কুইক স্টেপস। একটা লোককে ধরে-বেঁধে বুড়ো বানানোর চেষ্টা।”

“আর, তুমি কিছুতেই বুড়ো হতে রাজি নও তো!”

“আরে থিওরেটিক্যাল বুড়ো আর প্র্যাকটিক্যাল বুড়ো তো এক নয়।”

“তুমি তা হলে থিওরেটিক্যাল বুড়ো তো! বেশ বাপু, তাই না হয় হল, কিন্তু থিওরেটিক্যাল বার্ধক্যকেও তো একটু সমঝে চলতে হবে। তুমি তাকে মাড়িয়ে চললে কি তার সম্মান থাকে? সে শোধ নেবে না? তোমাকে বুড়ো হতে কেউ বলছে না। আমরা ধরেই নিচ্ছি তুমি খুব যুবাপুরুষ। কিন্তু যার যা পাওনা তাকে তা না দিলে সে ছাড়বে কেন?”

“আরে, এটা সে ব্যাপার নয়। স্ট্রোক বা প্রেশার থেকে তো হয়নি, ঘাড় থেকে হয়েছে, স্পন্ডেলাইটিস।”

“সেটা শুনেছি। তবু এখন একটু ধীর স্থির হও তো, বুড়ো না হয়েও সেটা তো হওয়া যায়। কবজিটায় তো এখনও কালশিটে পড়ে আছে। একটু কাছে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াও তো, রাজুর সোয়েটারটার মাপটা নিই। ও

তো তোমার মতোই লম্বা, না?”

“আমি পাঁচ এগারো, রাজু ছয় এক।”

“তা হলে দু’ইঞ্চি বাড়াতে হবে। রংটা দ্যাখো তো, রাজুকে মানাবে না?”

“তোমার কালার সেন্স আমার চেয়ে অনেক ভাল। হ্যাঁ রংটা তো দারুণ!”

“একটু টানটান হয়ে দাঁড়াও, নইলে ঠিক মাপটা পাওয়া যাবে না।”

সত্যচরণ পদ্মাবতীর নিকটবর্তী হলেন। এখনও নৈকট্য রোমাঞ্চকর। পদ্মাবতী সোয়েটারের মাপ নিতে ঘাড়ের কাছে হাতদুটো যখন ছোঁয়ালেন, তখন জোয়ারের জল উপকূলে আছড়ে পড়ছিল। সত্যচরণ বুকের মৃদু কম্পন এখনও টের পান। মৃদুস্বরে বললেন, “পদ্মাবতী, বিছানায় পড়ে থাকলে একটাই অসুবিধে। বড্ড তোমার কথা মনে হয়।”

“আমিও তো পথ চেয়ে বসে থাকি।”

৭

চিকু মরেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে বুলটন যখন চায়ের কাপটা নিয়ে লোহার চেয়ারটায় বসেছে, তখন ভয়ডরহীন চিকু টিভির টেবিলের তলা থেকে লাজুক মুখটা বের করে তার দিকে চেয়ে যেন একটু মেপে নিল তাকে। রোজই তার মাপজোক নেওয়া চিকুর স্বভাব। হেভি চালাক। মুখখানা ভালমানুষিতে মাখানো, এরাই বজ্জাত হয় বেশি। মেঝেয় কিছু একটু খাবারের টুকরো খুঁজে পেয়ে চিকু বোধ হয় ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছিল। বুলটন তার দিকে চেয়ে বলেই ফেলল আজ, "চিকু, রোজ কারও সমান যায় না, বুঝলি! আমারও দিন আসবে। আর তুই তো অমর নোস।"

চিকু কী বুঝল কে জানে। বুলটনের দিকে চেয়ে বোধ হয় বলল, ফোট শালা, মস্তানি অন্য জায়গায় দেখাস।

বুলটনকে অবশ্য ফুটতেই হল। ডিউটি।

ঘোষালবাবু আমেরিকায়। তাঁর দামি হাম্বার গাড়িটা এখন বুলটনের হেফাজতে। বারবার বলে গেছেন রোজই যেন গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে একটু চালিয়ে আনে বুলটন। নইলে গাড়ি বসে যায়, ব্যাটারি ডাউন হয়ে থাকে। বুলটন গাড়িটা আজ স্টার্ট দিয়ে দেখল তেলের কাঁটা এম্পটি দেখাচ্ছে। টাকা দিয়েই গেছেন ঘোষাল সাহেব। তারা, অর্থাৎ বুলটনরা যে ক্লাসে বিলং করে সেই ক্লাসের ছেলেরা আর কিছু না হোক গাড়ি চালানোটা শিখে রাখে, বলা যায় না, অন্তত ড্রাইভারের চাকরি হয়তো পাওয়া যাবে। গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বুলটন। শব্দহীন মসৃণ গাড়ি। পঁচাত্তর লাখের জিনিস। চালিয়েও আরাম। সেলিমপুর পাম্পে তেল ভরে সে অনেকটা চালাল আজ। গল্‌ফ গ্রিন পর্যন্ত। মনটা ভাল ছিল না ক'দিন, ভাল হয়ে গেল। সেই যে বাউন্সারের চাকরি ছেড়ে ফিরে এল, তারপর একদিনও বুলা আসেনি। ভয়ে ফোনও করে না সে। কী না কী মনে করবে। লাভ অ্যাফেয়ার তো আর নয় রে বাবা! যদি বলে বসে, এত আঠা কীসের তোমার বলো তো! নিজের প্রেস্টিজ নিজের কাছে। ফিরে এসে গাড়িটা জায়গায় রেখে অনেকক্ষণ গাড়িতেই বসে রইল সে। মাঝে-মাঝে তার নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে বাউন্সারের চাকরিটা কেনই-বা নিল না সে? এতকালের একটা ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাচ্ছিল, তবু পিছিয়ে এল কেন? সে কি বুলার জন্য! শুধু বুলা বারণ করেছিল বলে! তা হলে বুলা কে? কতখানি? এসব প্রশ্ন খুব বিপজ্জনক, কারণ এর জবাব খুঁজতে গেলে বোধ হয় শেষে নিজেকে আহাম্মক বলেই মনে হবে তার। হাসির পাত্র বলে মনে হবে হয়তো। গাড়িটা লক করে নেমে এল বুলটন। ল্যান্ডিংয়ে প্লাস্টিকের চেয়ারটায় বসে ঘটনাহীন ফ্যাকাসে একটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল।

কখন যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। তার দোষ নেই। নিষ্কর্মা বসে থাকলে ঘুম তো পাবেই। টেবিলের ওপর মাথাটা হাতের বালিশে রেখে হিজিবিজি স্বপ্নও দেখছিল সে। কে খুব নরম করে আলতো হাতে মাথাটা ছুঁয়ে খুব নিচু গলায় বলল, "ওঠো!"

বুলটনের ঘুম খুব সজাগ। টক করে মাথা তুলতেই বুলা হেসে ফেলে বলে, "এই বুঝি সিকিওরিটি গার্ড?"

বুলটন এত চমকে গিয়েছিল যে, মাথা কাজ করছিল না। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি!"

বুলা পাশের চেয়ারটায় বসে বলে, "কিছু ভাল লাগছিল না আজ। টানা কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হল এবার একটু হাঁফ ছাড়া দরকার। ভাবলাম, যাই, আমার বাউন্সার সাহেবের সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে আসি। মুখটা অমন শুকিয়ে গেছে কেন বলো তো! টিফিন খাওনি?"

"না, এখনও সময় হয়নি।"

"তা হলে আজ আর টিফিন খেতে হবে না। চলো, আজ সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের চাইনিজ় দোকানে দু'জনে খেয়ে আসি। যাবে? আমার হাতে আজ অনেক টাকা এসে গেছে।"

বুলটন হাসল। বলল, "যাব।"

৮

“ও মা! কী সুন্দর মানিয়েছে তোকে! ফিটিংটাও একদম ঠিকঠাক। ফিগার সুন্দর হলে সবকিছুই মানায়। হ্যাঁ রে, তোর পছন্দ হয়েছে তো!”

“মাসি, এত সুন্দর বুনেছ যে, গ্রীষ্মকালেও পরে ঘুরতে ইচ্ছে করছে।”

“ইয়ার্কি মারিস না তো, ফাজিল কোথাকার! বোস, আজ তোর জন্য পূরণপুরি বানানো করিয়েছি। খা।”

“মাসি, সকালে মা আজ ঢাকাই পরোটা খাইয়ে দিয়েছে যে!”

“তাতে কী! এই বয়সে অত ভেবেচিন্তে খেতে নেই। জয়াকে হাতে ধরে শিখিয়েছি পূরণপুরি কী করে বানাতে হয়। ওর রান্নার হাত ভাল। বসে শান্তিমতো খা তো! দুপুরে না হয় একমুঠো ভাত কম খাবি। সোয়েটারটা খুলে দে, একটা ক্যারিব্যাগে ভরে দিচ্ছি।”

“মাসি, জয়া এখন ঠিক আছে তো!”

“আর বলিস না। সেই আগের বয়ফ্রেন্ডটার জন্য কত কান্নাকাটি, কত গলা শুকোনো, ওমা! দু’মাসও যায়নি, শুনছি আবার একটা জুটিয়ে ফেলেছে। কী ঘেন্না বল তো! এত তাড়াতাড়ি শেলেটের লেখার মতো কাউকে মুছে ফেলা যায় জানতুম না বাবা! পারেও এরা!”

“মাসি, তোমাকে কিন্তু আর মানুষ করা গেল না। একটু আধুনিক হও তো!”

“রক্ষে কর বাবা! আর আমাকে এই এক্সচেঞ্জ অফারের যুগে এনে ফেলিস না তো!”

ফোনটা এল। একটু রাতের দিকে।

“হাই রাজু! আমি ইলিনা।”

“হাই ইলিনা!”

“আমি কি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?”

“নিশ্চয়ই ইলিনা।”

“আমি কিন্তু খুব টকেটিভ, ভীষণ বকবক করি। কিন্তু জানো তো, হঠাৎ আমার সব কথা হারিয়ে গিয়েছিল। একদিন কথাগুলো পাখিদের মতো উড়ে উড়ে বহুদূর চলে গেল, আমার কাছে আর একটাও কথা ছিল না। আবার অনেকদিন পর কথা ফিরে আসছে, যেমন পাখিরা বিকেলে ঘরে ফিরে আসে, তেমনই একে-একে ঝাঁকে-ঝাঁকে। এখন আমার ভিতরে কেবল কিচিরমিচির কথা আর কথা। অনেক-অনেক কথা। শুনবে?”

“নিশ্চয়ই। আমি নিজে কথা ভাল বলতে পারি না, কিন্তু চুপটি করে খুব মন দিয়ে শুনতে পারি। আই অ্যাম আ গুড লিসনার।”

“জানো রাজু, আমি যখন বড় হব, আর-একটু বড় হব...”

জাদুনল • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥

www.anandapub.in